দৃষ্টান্ত
প্রভাস ভদ্র

দৃষ্টান্ত

প্রভাস ভদ্র

সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

PROVASH BHADRA-R

DRISHTANTO

প্রথম প্রকাশ :

রথযাত্রা, ১৪২৫

প্রকাশক :

তুষার মজুমদার

সুবর্ণরেখা

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

বাণী আর্ট প্রেস

৫০এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,

কলকাতা - ৭০০০০৯

চলভাষ : ৯৩৩০৮৯৯৭২০

E-mail : baniartpress07@gmail.com

প্রচ্ছদ :

স্বর্ণালি ভদ্র

মূল্য :

দেড়শো টাকা

স্নেহের বোন
কল্যাণীয়া কাকলী নস্করকে

লেখকের অসংখ্য গল্প

যে সকল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে

গল্প

গল্পদশক

সমকালের গল্প

সময়ের কণ্ঠস্বর

স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

সিম্ফনী

নীল নীলা

অন্তত একজন

প্রাকৃতিক

গল্প চল্লিশ

উপন্যাস

স্বপ্ন বদলে যায়

আরাফ

সুজন, হাওড়া কাসুন্দিয়ার মৌমিতাকে এতকাল পর দেখলে চেহারার পরিবর্তনে নির্ঘাৎ চিনতে পারবে না। কিন্তু কখনও সখনও নিশ্চিত মনে পড়ে বলে আমার বিশ্বাস। তোমার সেই রোগা ছিপছিপে শরীর তোবড়ানো গাল আর রুখুসুকু অযত্ন চুলও এখন নেই। পরিবর্তে এখন বেশ সার্বিক ভরাট শরীর হয়েছে তোমার। অনেকটা স্থুলকায় ধনী মাড়োয়ারীর মতো। চুলও বেশ পরিপাটি আঁচড়ানো। বেশ সুখী সুখী জেল্লা।

তোমাকে চিনতে না পারার কোনো কারণই থাকতে পারে না। কেননা তুমি এখন তোমার নামেতেই যথেষ্ট পরিচিত।

ওই যথেষ্ট পরিচিতির জন্যই বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদ্ হিসেবে সেদিন তুমি ছিলে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে অন্যতম একজন। ঘটনাচক্রে সেদিন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তবে তোমার মতো মঞ্চে নয়। সুমুখের নির্দ্ধারিত আসনগুলিতেও নয়। ছিলাম, সাধারণ দর্শক আর শ্রোতাদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, 'মুখর মেলা'র কথাই বলছি। সত্যিই সর্বাত্মক মুখরিত মেলা।

সেই মেলার বিপুল ব্যয়ভার বহন করেছিল বিখ্যাত এক সুরা উৎপাদন সংস্থা। মেলার প্রধান প্রবেশ দ্বারে রাখা ছিল, মাঙ্গলিক মনসা গাছ। ছিল, ওদের আরাধ্য দেবতা কার্তিকের মাটির মূর্তি।

কোলকাতার ময়দান অঞ্চলে শীতকালীন বিভিন্ন মেলায় যেরকম বর্ণাঢ্য প্যাভেলিয়ন স্টলাদি থাকে, সেখানেও ছিল। ছিল, স্পনসারদের জৌলুসদার রকমারি বিজ্ঞাপন। নামী এক প্রকাশনা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছিল দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণীয় পুস্তিকা। তাতে ছিল, সেকাল একালের বারবণিতাদের সম্পর্কে জানা অজানা নানা তথ্য। ছিল, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রিত অজস্র আলোকচিত্র আর রঙতুলির ছবি। বিক্রিও হয়েছে আশাতীত।

সুজন, তুমি লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না। বারাঙ্গনা, বারবধূ, পতিতা ইত্যাদি বর্জন করে যৌনকর্মীরা সমস্ত রকম দ্বিধা সঙ্কোচ হীনমন্যতাহীন ছিল বেআব্রু প্রকাশ্যে। একান্তের নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ মলিন ম্লান মুখগুলি কি যে দারুণ খুশি ঝলমল উচ্ছল ছিল! যথেষ্ট সোচ্চার সবাকও বটে।

সুজন, তুমি জানতে কিনা জানি না। এ দেশের প্রতিটি রাজ্য থেকে তো বটেই, প্রতিনিধিরা এসেছিল নরওয়ে হংকং সিঙ্গাপুর ইন্দোনেশিয়া কম্বোডিয়া মালয়েশিয়া নেপাল বাংলাদেশ ইত্যাদি বিদেশ থেকেও।

চলছিল, তাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় বাক্যালাপ। খোশগল্প জটলা জমাটি আড্ডা। সেই সঙ্গে অকালে হোলির রং খেলা। সেই রং এড়াতে পারেনি আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকার গায়ক সমাজসেবী জনপ্রিতিনিধি শিল্পপতিরাও।

সুজন, মঞ্চে বসা তোমার চুলেও কিন্তু সবুজ আবীর আমি লক্ষ্য করেছি। আমার অবাক লেগেছিল। কেননা রং খেলা ভয়ানক অপছন্দ করতে তুমি। রং দিতে উদ্যত আমার হাত ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলে, 'মনের রংটাই আসল। বাহ্যিক ভন্ডামি আমার অপছন্দ।'

এই নিয়ে প্রশ্ন তুললে পাল্টা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ভীড়ভাট্টা হৈ হুল্লোড়ের পরিবর্তে শান্তস্নিগ্ধ নিরিবিলি যার পছন্দ সেইবা কেন অমন মানুষ গিজগিজ মেলায় গিয়েছিল?

নির্ভেজাল উত্তর একটাই, 'যাবতীয় মিডিয়ার ব্যাপক প্রচারে কৌতূহল আর হুজুগে।'

কৌতূহল হুজুগ তোমারও কম ছিল না সুজন।

তুমি ছিলে দর্পণদার বন্ধু। সেই সুবাদে আমার অবৈতনিক শিক্ষক। হওয়া উচিত ছিল গুরুস্থানীয়। অথচ, হয়ে গেলে বন্ধুর মতো। মেয়েদের শরীরের প্রতিটি স্তর সম্পর্কে তোমার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। অল্পেতেই জেনে গিয়েছিলে কোথায় আমাদের দুর্বলতা ঢাকনায় ঢাকা থাকে। তাকে উন্মোচিত করতে হয় কোন হুজুগে মাতিয়ে দিয়ে এবং নিজেও মেতে গিয়ে।

সুজন, সেই দিনটির কথা তোমার নিশ্চিত মনে আছেই। তুমি পড়াতে আমাদের দোতলার একমাত্র ছোট্ট ঘরটিতে। সেদিন ছিল বাদল দিন। 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল' গানের অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য ছিল না। আসলে প্রেমিকের ভূমিকায় তুমি আগেই জেনেছিলে, বর্ষার বারি আর বসন্তের বাতাস আমার শিরায় শিরায় দারুণ উন্মাদনা সৃষ্টি করে। আমি ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়ি। মনে হয়, 'হারিয়ে যেতে নেই মানা।'

তোমার পড়ানো আমার মগজে ঢুকছিল না। উন্মনা হয়ে পড়েছিলাম।

তোমার দেখছি আজ একদম পড়াশুনোয় মন নেই। তুমি তিরস্কারের ঢঙে বললে, কি ভাবছো অত?

আমি বললাম, কবিগুরুর গান মনে পড়ছে।

কোন গানটা?

'আজি ঝরো ঝরো মুখরিত....'

আর কোনো গান?

'পাগলা হাওয়ায় বাদলা দিনে....'

আর?

‘উতল ধারায় বাদল ঝরে....।’ এরকম অনেক।

আর সেই গানটা মনে পড়ে না? তুমি ফিচেল হেসে বললে, ‘এমন দিনে তারে বলা যায়....’। একবারও মনে হচ্ছে না।

ন্নাহ্। আমি দুষ্ট হেসে তোমার চোখে নিষ্পলক চোখ রেখে বললাম, এই মুহূর্তে তুমি এত কাছে না থাকলে হয়তো ওই গানটাই প্রথম হৃদয় জুড়ে থাকত।

এত কাছে আর কোথায়? তুমি ইংগিতে কিছু বোঝাতে চাইলে।

ওই গানটার সবটুকু মনে করে দেখ। তা ছাড়া, টেবিলের অপর প্রান্তে যতদিন থাকা যায় ভালো। অল্পেতেই পেয়ে গেলে সহজেই হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে।

তাই? এত কিছু জানো তাতো জানতাম না।

জানতে বুঝতে সময় লাগবে। ধীরে বন্ধু, ধীরে।

এরকম আরও কতক্ষণ হৃদয়গত সংলাপ বিনিময় চলত জানি না। দর্পণদা হঠাৎই ওপর ঘরে এসে বলল, আজ খিচুড়ি হবে। মা তোকে খেয়ে যেতে বলল। খাবিতো?

অবশ্যই। তুমি যেন এমনটি চাইছিলে। সেই সঙ্গে নির্ভেজাল মনের ইচ্ছা জানালে, সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা হলে জমবে ভালো। যাবি একবার? টাকা আমি দেব। লেবার তোর।

দর্পণদা এককথায় রাজি হয়ে গেল। টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, মৌকে আজ তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দিস। খিচুড়ি রান্নায় অনেক হ্যাপা আছে। মাকে একটু সাহায্য করা দরকার।

এমনটি জানলে তুমি বোধহয় ওকে মাছ কিনতে পাঠাতে না। দর্পণদা চলে যেতে আমি যে ইংগিতটা করলাম তুমি তা ঠিক ধরতে পারলে না। অবাক হয়ে বললে, এমনটি অর্থে কি বলতে চাইছো ঠিক বুঝলাম না।

আমি বললাম, ইলিশ মাছ ভাজা খেতে চাইলে। অথচ এমন ভাব করছো যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জান না। তুমিতো চাইছিলে, দর্পণদা এখানে বসে আমাদের বর্ষা বিরহ প্রেম ভালোবাসা নিয়ে আলোচনায় ব্যাঘাত না ঘটায়।

এতটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরলে এতদিনে কবেই ভাজা মাছ উল্টে খেয়ে ফেলতাম।

অত সহজ না। চেষ্টা করে দেখতে পার।

সুজন, আমার সেদিনের কথায় তুমি হয়তো আহত হয়েছিলে। চিনচিনে যন্ত্রণার একটা কাঁটা তোমাকে বিদ্ধ করেছিল। সেই কাঁটাই তোমাকে নিয়ত খোঁচাত। তাই, কথা নয় কাজের মাধ্যমে জবাব দিতে নিরন্তর পরিকল্পনা প্রচেষ্টা ছিল তোমার। সেই জন্যই হঠাৎ হঠাৎ আমাদের পরিবারের সবাইকে হুজুগে মাতিয়ে তুলতে তুমি।

একবার এক অভাবনীয় হুজুগ তুললে তুমি। মা বাবার বিবাহ বার্ষিকী পালন

করবে। ওদের কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য করোনি। দুজনের জন্য দামী শাড়ি ধুতি পাঞ্জাবী এনেছিলে। সঙ্গে ফুল আর মিষ্টি। বাধ্য হয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যয়টা বাবাকে করতেই হয়েছিল। রান্নাটা মা ভালোই করেছিল। দিনটা আমাদের ভালোই কেটেছিল।

বিকেল পর্বের জন্য গোপন রেখেছিলে দারুণ এক বিস্ময়। দীর্ঘদিনের যাতায়াত মেলামেশায় কথা প্রসঙ্গ জেনেছিলে, যাত্রা থিয়েটার বাবার খুউব প্রিয় পছন্দ। তাই সান্ধ্য-শোয়ের থিয়েটারের দুখানা টিকিট এনেছিলে, শুধুমাত্র বাবা মার জন্যে। তুমি আর দর্পণদা মিলে ওদের দু'জনকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এসেছিলে।

সুজন, যাদের জন্য তুমি এত করলে সেই বাবা মা বলে গিয়েছিল তোমাকে যেন রাতের খাবারটা খাইয়ে ছাড়া হয়। শুনে তুমি বললে, তাহলে তো সিগারেট আনতে যেতে হবে। স্টক শেষ। বিস্তর সিগারেট খেতে অভ্যস্ত তুমি। তা আমাদের অজানা ছিল না। তবু দর্পণদা ভাবল, সিগারেট কেনার অজুহাতে না খেয়ে পালালে বাবা মা অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে।

তা ছাড়া আমাদের বাড়ি থেকে সিগারেটের দোকান অনেক দূর। এদিকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুমোট গরমে মালুম হচ্ছিল, বৃষ্টি হতে পারে।

দর্পণদা বলল তোকে যেতে হবে না। আমিই এনে দিচ্ছি।

দর্পণদা ছাতা নিয়ে বাড়ির বাইরে যেতেই ঝড় উঠল। সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। সেই সঙ্গে হৃদপিণ্ড চমকানো মুহুর্মুহু বজ্রপাত।

আমি তড়িৎবেগে একের পর এক জানলা দরজার ছিটকিনি অর্গল বন্ধ করলাম। তারপর চুপচাপ স্থির বসে 'বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে' তোমার দিকে তাকালাম। রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ শুনছিলাম। বুঝতে পারলাম শুধু 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' নয়, তোমারও। নির্বাক তুমি আমার কাঁধে হাত রাখলে। তোমার স্পর্শ আমার শরীরময় অদ্ভুত এক শিরশিরানি সৃষ্টি করল। রক্ত প্রবাহ তীব্রতর হল। আমি যেন শুনলাম তুমি গুনগুনিয়ে বলছ 'তোমার দ্বারে কেন আমি' সেকি বোঝ না? নাকি না বোঝার ভান করে থাক?

আগেই বলেছি, বর্ষা বসন্ত আমাকে দারুণ দুর্বল করে দেয় আমি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়লাম যে আমার ঠোঁট প্রস্ফুটিত হলো। শরীরে কাঁপন ধরলো।

সুজন, প্রকৃতি-প্রভাবিত সেই সুযোগটাই নিয়েছিলে তুমি। অনাস্বাদিত নিষিদ্ধ ফল সর্বপ্রথম খেতে কার না ভালো লাগে। অস্বীকার করছি না সেদিন আমার 'রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ' জেগেছিল। তবু, আর একদিনের জন্যও নয়। পরবর্তীকালে কষ্টকর সংযমে তোমাকে আমি বার বার ফিরিয়ে দিয়েছি। দারুণ সাবধানী হয়ে গিয়েছিলাম আমি। কেননা আমার মনে হয়েছে 'তোমার শরীরে সত্য একমাত্র কদর্য পিপাসা।'

সুজন, আমি চেয়েছিলাম তোমার ভালোবাসা।

ভালোবাসা বলতে তুমি বুঝতে এক ধরনের উগ্র অনুভূতি আর আচ্ছন্নতা। যা থেকে জন্ম নিয়েছিল, অবাধ্য দাবী বা অধিকার বোধ।

ন্যায় অন্যায় লজ্জা ঘৃণা ভয় ইত্যাদি বোধগুলি তোমার লুপ্ত হতে বসেছিল।

তুমিতো আমাকে ভালোবাসতে না। আমাকে ভালো লাগত মাত্র।

কবিগুরুর কথায়, 'যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে। সেখানে ভালোবাসা ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের সুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা। যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।'

সুজন, ভোগের তৃপ্তিতে বাধা পাওয়ায় তুমি ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলে।

তোমার আচার আচরণ এবং পড়ানোর পরিবর্তিত ঢং দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, দিন দিন তুমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছো। আমাদের বাড়িতে আসার আকর্ষণ দ্রুত শিথিল হয়ে আসছে। কি দিয়ে তোমাকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখা সম্ভব সেই বোধ আমার তখন ছিল।

তবু আমি তেমনটি চাইনি।

আমার বিশ্বাস ছিল, দুম করে এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো মানসিক শক্তির অধিকারী তুমি নও।

এই বিশ্বাসের জন্মসূত্র কবিগুরুর 'শেষ রক্ষা'য় পড়া বিশেষ দুটি বাক্য। মনে গেঁথেছিল, 'মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেননি। পুরুষ অনেক ঠেকে, অনেক ঘা খেয়ে তারপর ভালোবাসতে শেখে।'

আমি লক্ষ্য করলাম, বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানোর আগ্রহটা তোমার ক্রমশ কমছে। ইউনিভারসিটির ফাইনাল পরীক্ষার পড়াশুনো আর ছাত্র ইউনিয়নের কাজে তোমার ব্যস্ততা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেল। হাতে সময় কোথায় যে, আগেকার মতো অত বেশি আসবে! বুঝলাম, আসলে ওসব তোমার অজুহাত মাত্র। পরীক্ষা-প্রস্তুতি যদি সত্যিই অন্যতম কারণ হবে তাহলে বিপ্লবের গর্ভযন্ত্রণা আর মুক্তির দশকের আন্দোলনে সামিল হওয়ার সময় বাড়ালে কেমন করে!

আমাদের বাড়িতে আসার বেলায় তোমার যত সময়াভাব।

আসলে অন্য কারণ ছিল।

তোমার ক্রমবর্ধমান উন্নাসিকতা আমার ভালো ঠেকছিল না।

সেজন্য তোমার মুখ থেকে প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলাম। আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি। এর মধ্যে অপরাধ কোথায়? এটাই তো মেয়েদের চিরন্তন মানসিকতা।

অথচ, তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলে, অবিশ্বাস! বিশ্বাস হারালে প্রেম ভালোবাসার প্রয়াণ হয়। অকালে এমনতর ছেলেমানুষী আচরণ করো না।

কথায় কে পারবে তোমার সাথে!

সুজন, তুমি আর দর্পণদা ছিলে সাহিত্য বিভাগের ছাত্র। দু'জনে মিলে দেয়ালপত্রিকা বের করতে। দর্পণদার হস্তাক্ষর অতীব সুন্দর। আঁকতও ভালো। পরে

দু'তিন সংখ্যা রুগ্ন লিটল ম্যাগাজিনও বের করেছিলে। রক্তাল্পতায় বন্ধ হয়ে গেল। তবু কেউই লেখা ছাড়লে না। অনেক লিটল ম্যাগাজিনেই তোমাদের লেখা গল্প প্রকাশিত হতো।

এক সময় তুমি অতিদ্রুত এগিয়ে গেলে। প্রথম শ্রেণির পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেলে তুমিই প্রথম। অথচ আশ্চর্য, সেই গল্পটা কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গল্পের চাইতে উন্নতমানের ছিল না। আমি দর্পণদা এবং তোমার অন্যান্য বন্ধুরা সকলেই অবাক হয়েছিলাম। অনেকে গূঢ় রহস্য-সন্ধানী মন্তব্য জুড়েছিল।

কেমন করে লেখাটা ছাপানোর সুযোগ হল সে সম্পর্কে নানাজনের হরেক প্রশ্ন ছিল। ঘনিষ্ঠতাসূত্রে দর্পণদা খোলা মনে সরাসরি প্রশ্নটা তোমাকেই করেছিল।

তুমি বললে, ডাকে পাঠিয়েছিলাম। পছন্দ হয়েছে, ছেপেছে। কাজেই ভবিষ্যতেও পাঠাব।

দর্পণদা কতদূর বিশ্বাস করল জানি না, আমার কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চায়নি। কিন্তু লেখাটা অমন একটা বিস্তর সার্কুলেশনের পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় খুশি হয়েছিলাম।

সুজন, তোমরা ক'জন বন্ধু একত্রে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে ফেরীঘাটে আড্ডা দিতে। বৃহস্পতিবার দিনটা ধার্য ছিল অনুগত-র সুবিধার দিকে তাকিয়ে। কেননা, অনুগত পড়াশুনোর ফাঁকে ওর বাবার 'ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়'-এ বসে সাহায্য করত। ওই দিনটা দোকান বন্ধ থাকত।

সেই আড্ডায় বাবুঘাট থেকে খেয়ায় পেরিয়ে ভবানীপুরের অনন্য আসত। আসত খিদিরপুরের নিগূঢ়। এপারের শিবপুরের জয়েশ লিলুয়ার নিরুক্ত আর সাঁত্রাগাছির প্রত্যুষ থাকতই থাকত। আরও অনেকেই মাঝে মধ্যে এক আধদিন উপস্থিত থাকলেও আমি ওদেরকে চিনি জানি না।

এদেরকে চেনাজানার সুযোগ এনে দিয়েছিল সেই বর্ষা। বর্ষাকালে তোমাদের আড্ডার কোনো স্থায়ী ঠিকানা থাকত না। যখন যেমন পদ্ধতিতে কখনও সখনও আমাদের বাড়িতেও। দোতলার ওই ছোট্ট ঘরটিতে।

সুজন, সে সময় তোমার গতি অপ্রতিরোধ্য। একের পর এক প্রথম শ্রেণির পত্রপত্রিকায় তোমার লেখা বের হচ্ছে। বৈপ্লবিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণে খবরের কাগজে তোমার নাম থাকছে। আড্ডা দেয়ার সময় কোথায়। অন্যরাও নানা কারণে অনিয়মিত হয়ে পড়ায় আড্ডাটা শুধুমাত্র দর্পণদা আর অনুগত-র মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। খেয়াঘাটের পরিবর্তে আমাদের বাড়িতে। নির্দ্ধারিত বৃহস্পতিবারের বদলে পূর্ব নির্দ্ধারিত দিনক্ষণে।

দর্পণদা একদিন আক্ষেপ করল, জানিস সুজন আজকাল আর আমাদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না। সালকিয়া এমন কিছু দূরে তো নয়। তবুও।

রাজনীতিতে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছে। আমি তোমার হয়ে বললাম, ওর প্রতিভা নিষ্ঠা আছে। আজকাল দারুণ দারুণ গল্প লিখছে। দেখে নিস, একদিন নিশ্চিত নাম করা লেখক হবে।

বুঝি। দর্পণদা স্বপক্ষে বলল, আমিতো ওকে ঈর্ষা করি না। বরং ওর বন্ধু বলে গর্ববোধ করি। তবু কেন জানি না আমার মনে হয়, সুজন আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। বলেছিলাম, সাহিত্য আর রাজনীতি একসঙ্গে চলে না। ওসব ছেড়ে ছুড়ে তুই বরং শুধু সাহিত্য আঁকড়ে ধরে থাক। আমার পরামর্শের কোনো গুরুত্ব দিল না।

আমি বললাম, তোমার পরামর্শটা হয়তো ওর পছন্দ হয়নি। তাই—

তাই বলে এতদিনের বন্ধু সম্পর্কটা ছিঁড়ে ফেলবে! দর্পণদা ঈষৎ উত্তেজনায় বলল, যেন হাতির পাঁচ পা দেখেছে।

অন্য কিছুও তো হতে পারে। আমি দর্পণদাকে অভিযুক্ত করে বললাম, তোমার একবার ওর বাড়িতে খোঁজ নেয়া দরকার ছিল। মানুষের বিপদ আপদের কথা কিছু বলা যায় না। এমনও তো হতে পারে যে, জঙ্গী আন্দোলন করতে গিয়ে বিপদ সমস্যার জটিল জালে জড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক বলেছিস। দর্পণদা নিজের দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত থাকতে বলেছিল, যাব একদিন।

সুজন, ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত দর্পণদার পক্ষে তোমাদের বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ, সেদিনই বাবা সোজা অফিস থেকে ট্যাক্সিতে চেপে বাড়িতে ফিরেছিল।

সে সময় আমাদের দুজনেরই থাকার কথা নয়। তবু ঘটনাচক্রে ছিলাম।

ট্যাক্সি দেখেই বুঝতে পারলাম, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

দর্পণদা দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সি থেকে হাত ধরে বাবাকে নামাল। সঙ্গে আসা অফিসের কর্মীটিকে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে?

এমন কিছু না। বাবা স্বাভাবিক হেঁটে এসে বিছানায় বসে বলল, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে হঠাৎই মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। এক মুহূর্ত অন্ধকার দেখলাম। হয়তো পড়ে যেতাম। কে একজন ধরে ফেলায় সেটা হয়নি। অনেকে মিলে লম্বা বেঞ্চিতে শুইয়ে দিয়ে জল খাইয়ে বাতাস করল। ব্যস্ ঠিক হয়ে গেলাম।

ঠিক আছে, তুমি এখন চুপ থাক। দর্পণদা খারাপ কিছু একটা আশঙ্কা করে বাবাকে চিৎ করে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমি এক গেলাস গ্লুকন ডি এনে দিলাম। দর্পণদা ডাক্তার ডাকতে গেল।

ডাক্তার ডাকার কোনো দরকার ছিল না। বাবা নিচু স্বরে বলল, অফিসের ওরা তো কাছেই হাসপাতালে পাঠাতে চেয়েছিল। আমিই বারণ করেছি।

কেন বারণ করেছো? সঙ্গে আসা কর্মীটিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে মা বলল, সব তাতেই তোমার গোয়ার্তুমি। বয়স হচ্ছে ভাবতেই চাও না। তোমার কিছু একটা অঘটন ঘটে গেলে আমাদের কি হবে ভাববে না!

উনিই বললেন, বাড়িতে চলে যাই। অফিসের কর্মীটি জানাল, বললেন যা ভ্যাপসা গরম। পেটে উইন্ড থেকে হয়েছে। বাড়িতে বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

দর্পণদা ডাক্তার নিয়ে এলো। দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দর্পণদাকে ডাক্তারবাবু একান্তে ফিসফিসিয়ে বলল, ম্যাসিভ স্ট্রোক। প্রেসার দারুণ লো। গ্লুকনের জল খাওয়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। কি করে বেঁচে আছে সেটাই অবাক কান্ড। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ট্যাক্সিতেই। অ্যাম্বুলেন্স খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।

তারপর তেইশ দিন হাসপাতালে ছিল বাবা। ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে ছাড়া পেয়ে জেনারেল বেডে ছিল। ক্রমশ ভালোই হয়ে উঠছিল। অথচ, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

শেষের দিনটা আমার আজও স্পষ্ট স্মরণে আছে।

রোজই দর্পণদা হাসপাতালে রাত কাটাত। সঙ্গী পেলে ভালো, নইলে একা। রাতের খাবার খেয়ে দর্পণদা পৌঁছালে তবে আমি ছুটি পেতাম।

সেদিনও বাসে বসে বাড়ি ফিরছিলাম। মনটা বিষণ্ণ উদ্‌ভ্রান্ত। কেননা, ইনটেনসিভ কেয়ারের ঠাণ্ডা ঘরে থাকায় বাবার বুকে প্রচুর কফ জমেছিল। সেজন্য ডাক্তারদের উদ্বেগ লক্ষ্য করছিলাম। উদ্বেগ দুশ্চিন্তা আমারও।

আমাদের বাড়ির ধারে কাছে কারও বাড়িতে সে সময় ফোন ছিল না। পরিচিত একজনের ফোন নম্বর হাসপাতালে দেয়া ছিল। আমরাও সঙ্গে রাখতাম। হঠাৎই মনে হল, বাড়িতে ফিরে যদি শুনতে পাই আমার আগে বাবার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে গেছে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম, পাড়ায় একমাত্র আমাদের বাড়িতেই বিদ্যুৎ বিকল। অর্থাৎ কিনা, খবর দেয়া হবে না। আমরা দিলেও শুধুমাত্র একটি বাড়ির জন্য রাত্রে কোনো মিস্ত্রি পাঠাবে না। ভাদ্রমাসের গরমে বিনিদ্র কাটাতে হবে।

ভাবলাম, শুধু আমাদের বাড়িতেই অন্ধকার কেন? তবে কী শোকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ!

বাড়িতে ঢোকার মুখে অন্ধকারে মিশে থাকা একটা কালো বেড়ালের জ্বলন্ত দুটো চোখ দেখে আমার উদ্বেগ তীব্র থেকে তীব্রতর হল।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠা অস্থিরতা মা-র মনেও কম কিছু না। সেজন্য তেইশ দিন ধরে শুধুমাত্র মাছ ভাত ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পদ রান্না করত না।

মাছ মুখে দিতে আমার শরীর শিরশির করে উঠল। মুখে অরুচি এলো। অথচ, কোনো দিনতো এমনটি হয় না। এবারও সেই একই আশঙ্কা, তবে কী বাবার খারাপ খবর?

মাকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে শুতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় মনে হল, একটা গাড়ি এসে বাড়ির সুমুখে দাঁড়াল। তারপর যেন কারও অস্পষ্ট অবতরণের শব্দ শুতে পেলাম।

উৎকণ্ঠিত মানসিক অস্থিরতাকালে শুকনো পাতার শব্দেও কল্পিত নানা ভীতি-চিত্র ফুটে ওঠে। আদতে সেগুলি ভ্রম। তবু আমি লণ্ঠন হাতে সন্তর্পণে নিঃশব্দে দরজার অগল খুললাম। উন্মোচিত দরজায় দাঁড়িয়ে সুমুখে যেন এক বিশাল প্রস্তর মূর্তি দেখলাম। তিনি যে সেই দূরের ফোনওলা বাড়ির মালিক তা বুঝতে অসুবিধা হল না।

নির্বাক স্তম্ভিত আমাকে তিনি যতটা সম্ভব সমব্যথী–সুরে বললেন, স্যরি। দর্পণবাবু কিছুক্ষণ আগে ফোনে দুঃসংবাদটা জানিয়েছেন। ফাদার এক্সপায়ার্ড।

সুজন, মা বলার আগেই দর্পণদা লোকমারফৎ তোমাদের বাড়িতে দুঃসংবাদটা পাঠিয়েছিল। তুমি বাড়িতে ছিলে না। পরে হয়তো শুনেছিলে। কিন্তু তোমার আসার উপায় ছিল না। দর্পণদার যেসব বন্ধুরা পরে এসেছিল ওদের একজনের কাছ থেকে শুনেছি, পুলিশ নাকি তোমাকে হন্নে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি গা ঢাকা দিয়ে অজ্ঞাতবাসে আছো।

গ্রেপ্তার হলেও তুমি ফাইনাল পরীক্ষাটা তবু দিতে পারলে। পাশও করলে। বাবার অকাল প্রয়াণে দর্পণদার আর পড়াশুনো চালানো সম্ভব হল না। মন থেকে সাহিত্য চিন্তা উবে গেল। অসহায় দিশাহারা অবস্থা। মাথার ওপর গাছ ছাতা ছাদ না থাকলে যেমনটি হয়ে থাকে।

বাবার মৃত্যুর পর গর্ভধারিণী মা বেশিদিন বাঁচল না। সঠিক চিকিৎসার অভাবে বাবার কাছে চলে গেল।

সে এক দারুণ দুঃসময়। যে কোনো একটা চাকরির সন্ধানে দর্পণদা উদ্ভ্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধানবাদের কোলিয়ারীতে সামান্য বেতনের একটা চাকরি যদিও বা পেল স্থায়ী হল না। তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুবাদে সন্দেহ বশে দর্পণদাকে অনেক পুলিশি ঝক্কি ঝামেলা সামলাতে হয়েছে। শেষমেশ অন্যায় অন্যায্যভাবে বিতাড়িত হয়ে ফের বাড়িতে ফিরে এসেছে।

এরপর দর্পণদা যখন সামান্য প্রুফ রিডার হিসেবে অখ্যাত এক সংবাদ পত্রিকায় কাজে যোগ দিল তখন তুমি কারাগারে।

একদিন দর্পণদাই বলল, জানিস সুজন রাজসাক্ষী হয়ে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছে।

জানব কেমন করে? জানতে আগ্রহী আমি জিগ্যেস করলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

ন্নাহ্। সে তো এখন বিদেশে। তারপর বিষণ্ণ শোনাল, পুলিশ ওর ওপর বর্বরের মতো অত্যাচার করেছে। শারীরিক নির্যাতনে ওর মেরুদন্ড পাঁজর দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই ভালো চিকিৎসার জন্য বিদেশে গেছে।

শুনে আমার ভীষণ কষ্ট হল। চোখে জল এসে গিয়েছিল। কোনো রকমে সামাল দিলাম। নির্বাক ভাবলাম, সুজনদের মতো প্রতিবাদী মানুষের মেরুদন্ড কোনো অত্যাচারেই গুঁড়িয়ে যাওয়ার নয়। সময়ে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে।

সুজন, তুমি আমার ভাবনাটা ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিলে। পরবর্তীকালে আমার মনে হয়েছে, তোমাদের চিন্তা ভাবনা নীতি মতাদর্শে কোথাও কিছু খাদ হয়তো ছিল। তা না হলে অত যে জীবন যৌবন সোনা আর হীরার টুকরো ওকালে নিভে গেল, কাজের কাজ কিছু হল না কেন!

বিদেশ থেকে সুচিকিৎসা অন্তে অদ্ভুতরকম পাল্টে গেলে তুমি। প্রথম নিজেকে শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চাতেই সীমাবদ্ধ রাখলে। পরে বুঝলে, এ যুগে সর্বক্ষণের লেখক হলে চলবে না। চাকরি একটা চাইই চাই। থাক না কর্মক্ষেত্রে অনেক ফাঁকি।

অনেক হিসেব করে তুমি এ্যাড এজেন্সি সংস্থায় চাকরি নিলে। অনেক নামী দামী বাণিজ্য-দ্রব্যের বিজ্ঞাপন তোমার হাতে। গিভ এ্যান্ড টেক পলিশিতে আরও বিস্তর পত্রপত্রিকা তোমার লেখা ছাপাতে লাগল। একটা টেলিফিল্মও হল তোমার লেখা গল্প অবলম্বনে।

শুরুটা কিন্তু ভালোই ছিল। আমি দর্পণদাও চেয়েছিলাম, লেখক হিসেবে তুমি সার্থক হও। শ্রদ্ধা ভালোবাসা পাও। অর্থ উপার্জন যেন একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়। ফরমায়েসী লেখা না লেখ। বিবেক বিকিয়ে না দিয়ে তোমার কলম হয়ে উঠুক স্বাধীন নিরপেক্ষ। সত্য সুন্দরের পূজারী হও তুমি। আরও অনেক কিছু।

সুজন, তোমাকে নিয়ে আমার এত আশা স্বপ্ন কেন জান? নজরুলের কথায় বলা যায়, 'যাকে সত্যিকার ভালোবাসা যায়, সে অপমান আঘাত করলে হাজার ব্যথা দিলেও তাকে ভোলা যায়। প্রিয়ের দেয়া সেই ব্যথাও যেন সুখের মতোই প্রিয় হয়ে ওঠে।'

শাহীর লুধীয়ানজীর সেই শেরটা মনে আছে?

'তুম মুঝে ভুলভি যাও এ হক্ হ্যায় তুমকো,
মেরি বাত্ ঔর হ্যায় ম্যায়নে তো মুহব্বৎ কি হ্যায়।'

অর্থাৎ, আমাকে ভুলে যাওয়ার অধিকার তোমার আছে। আমার কথা আলাদা, আমি তোমাকে সত্যিকার ভালোবেসেছি বলেই ভুলতে পারিনি।

সে সময় আমি তোমার প্রকাশিত প্রতিটি লেখার একনিষ্ঠ পাঠিকা। একই লেখা

বার বার পড়তাম। চরিত্রগুলির নাম ওদের সংলাপ প্রায় মুখস্থ হয়ে যেত। অনেক লেখা পড়ে এত বেশি অভিভূত হয়ে পড়তাম যে অভিনন্দন জানিয়ে প্রকাশক পত্রপত্রিকা অফিসের ঠিকানায় তোমার নামে চিঠি লিখতাম। তেমন একাধিক চিঠি ছাপাও হয়েছে চিঠিপত্র বিভাগে। অথচ আশ্চর্য, তুমি কোনো প্রাপ্তি সংবাদটুকু পর্যন্ত জানানোর সৌজন্য দেখাওনি। সেকালের বিখ্যাত লেখকদের কিন্তু এই বিশেষ ভদ্রতাবোধটুকু ছিল। এটাই তো সভ্যতা।

সুজন, তবু নাছোড় আমি।

অজ্ঞাতবাস সময়ে তুমি বাগবাজারে থাকতে জানতাম। পরে জেনেছি, সালকিয়ার বাড়ি ছেড়ে পাকাপাকি থাকছো শোভাবাজারের বাড়িতে। কিন্তু ঠিকানাটা পাই কোথায়? অনেক ভেবেচিন্তে জোগাড় করলাম একটি পত্রিকা অফিস থেকে। ফোন নম্বরও পেয়েছিলাম।

সকাল বিকেল সন্ধ্যা রাত্রি কতদিন কতবার যে তোমাকে ফোনে পেতে চেষ্টা চালিয়েছি! সব সময় নিরাশ হতে হয়েছে। একবারও তুমি রিসিভার তুলে বলোনি, হ্যালো।

অতি সকালে ফোনে তোমার খোঁজ করলে উত্তর আসত, উনি, ঘুম থেকে ওঠেননি।

একটু বেলা করে ফোন করলে জবাব মিলত, বাথরুমে আছেন।

তারপরেও তোমাকে চেয়ে জানতে পেরেছি, উনিতো এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

বিকেলে অফিস ছুটির পর যেসময় বাড়িতে ফেরা সম্ভব সেই সময় থেকে বেশি রাত অব্দি ফোন করেও তোমাকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। সেক্ষেত্রে প্রথম পর্বের উত্তর থাকত, এখনও ফেরেননি। বেশি রাত হলে জানাত, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তারপর একসময় মনে প্রশ্ন জেগেছে তাহলে তুমি লেখ কখন? নিজেই উত্তর খুঁজে নিয়েছি, লেখার সময় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য তোমার নির্দেশ মতোই হয়তো এমন সাজানো জবাব দেয়া হয়ে থাকে। পরে দর্পণদার কাছ থেকে শুনেছি, আজকালকার প্রতিষ্ঠিত ব্যস্ত লেখকদের এটাই নাকি কালচার। সুজনও তো ব্যস্ত প্রতিষ্ঠিত। ব্যতিক্রম আচরণ করবে কেন। ... তবু, আমার মন বড় অবাধ্য। ভীষণ জেদ হল। তোমার অফিসের ঠিকানা জোগাড় করলাম। দর্পণদাকে না জানিয়ে গেলামও একদিন।

তুমি অফিসেই ছিলে। ভিজিটর শ্লিপ লিখে ওপরে যাওয়ার সময় প্রহরী বলল, ফেরার সময় ওঁনার সই করিয়ে আনবেন। লিফট থেকে নামতেই সুমুখে রিসেপসান কাউন্টার। কাঁচঘর থেকে রিসেপসনিস্ট মহিলাটি ভিজিটার স্লিপে তোমার নাম দেখে বলল, কি দরকার?

অসন্তুষ্ট স্বরে জবাব দিলাম, লেখা আছে দেখুন—পার্শোনাল। ব্যক্তিগত।

হবে না। বরফশীতল জবাব শুনলাম, এখন উনি জরুরী মিটিং-এ ব্যস্ত।

বেশতো মিটিং-এর পরেই না হয় দেখা করবো। এত কাছে এসেও তোমার সঙ্গে দেখা হবে না ভাবতে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, আমি ওঁর আত্মীয়া। দয়া করে আমার স্লিপটা কাউকে দিয়ে একবার পাঠিয়ে দেখুন। নিশ্চয়ই সাক্ষাতের সময় জানিয়ে দেবে।

সুজন, আমার কথায় বিশ্বাস রেখে রিসেপসনিস্ট ভদ্রমহিলা ভিজিটর্স স্লিপটা না পাঠালেই বোধহয় ভালো হতো। কেননা, তুমি সেদিন চূড়ান্ত অপমান করে জানিয়ে দিয়েছিলে, আজ কিছুতেই সময় দেয়া সম্ভব নয়।

এর বেশ কিছুদিন পর খুশি ঝলমল দর্পণদা বলল, অবাক করে দিয়ে সুজন আজ আমার অফিসে এসেছিল। সঙ্গে রক্তিম রায় নামে এক বন্ধু ছিল। এককালে আমার মতো লিখত টিখত। 'অনির্বাণ' নামে একটা লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করে। কলেজ স্ট্রিটে ওদের প্রেস পাবলিকেশন আছে। বেশ পরিচিত নাম।

বুঝলাম। আমি অন্যুৎসাহে জবাব দিলাম।

কি বুঝলি? দর্পণদা অবাক হল।

বলব না। তুমিই বল, কেন এসেছিল?

রক্তিম-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দর্পণ দত্ত। ইউনিভার্সিটিতে 'দিনকাল' নামে দারুণ দেয়াল পত্রিকা বের করত। হাতের লেখা নয়তো যেন মুক্তাক্ষর। আঁকাতেও হাত ভালো। লিটল ম্যাগাজিনে লিখত টিখত। এখন যে কোনো কারণেই হোক লিখছে না। একে তোর অনির্বাণ-এর সঙ্গে রাখলে কাজে আসবে।

সুজন, সেই থেকে দর্পণদা 'অনির্বাণ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ফের লেখালেখি শুরু করল। প্রতি সংখ্যাতেই অনেকের মধ্যে তোমার আর দর্পণদা-র লেখা পড়তাম। সম্পাদক হিসেবে রক্তিম রায়, সহঃ সম্পাদক সুজন চৌধুরী আর সহযোগী সম্পাদক হিসেবে দর্পণ দত্তর নাম ছাপা হত। একসময় লক্ষ্য করলাম, সহঃ সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা থাকলেও তোমার কোনো গল্প থাকছে না।

কিন্তু কেন? প্রশ্নটা একদিন দর্পণদাকে করে বসলাম।

দর্পণদা বলল, সুজন এখন অনেক দরের লেখক। খামোকা তিনশো কপির লিটল ম্যাগাজিনে বিনা দক্ষিণায় গল্প দিতে যাবে কেন?

এই মানসিকতা কি তুমি সমর্থন কর? আমি প্রশ্ন করলাম।

এটাই একালে স্বাভাবিক। দর্পণদা এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিল।

তাহলে সহঃ সম্পাদক হিসেবে ওর নাম ছাপা হয় কেন? আমি সবিস্ময়ে জানতে চাইলাম।

এই প্রশ্নটা একদিন রক্তিমকে আমিও করেছিলাম। উত্তরে যা জবাব দিল, সেটাও একালের নিরিখে বাস্তববোধের পরিচয় মনে হল।

রক্তিম বলেছিল, সুজন চৌধুরী এখন পরিচিত নাম। সুতরাং ওর নাম সহঃ সম্পাদক হিসেবে ছাপলে অনির্বাণ এর ওয়েট বাড়বে বৈ কমবে না। সুজন যে আমাদের বন্ধু সেকথা সর্বজনে আমরা যে প্রচার করি তা অনেকটা একই উদ্দেশ্যে কিনা।

সেদিনকার মতোই দর্পণদাকে বললাম, বুঝলাম! কি বুঝলাম জানতে চেও না।

কি হেঁয়ালি করছিস? দর্পণদা বিরক্ত হয়ে বলল, সুজনকে তুই বোধহয় আজকাল আর ভালো নজরে দেখতে ভাবতে পারিস না। এখানে আর আসে না বলে তোর যত রাগ।

সুজন, সেদিন দর্পণদার কথায় আমি কোনো জবাব দেইনি। কেন জান? আমি চাইনি যে তোমাদের দুজনের বন্ধুত্বে ফাটল ধরুক। আমি চেয়েছি ও নিজেই একদিন তোমাকে ঠিকঠিক বুঝতে শিখুক। তা ছাড়া, আমার অনুমানটা তো ভুলও হতে পারে।

রক্তিম একদিন আমাদের বাড়িতে এলো। শিবপুরে কি কাজে গিয়েছিল। ফেরার পথে দর্পণদাকে ওর প্রয়োজনে সঙ্গে আনা গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। ব্যস্ত মানুষ। সময় নষ্ট করতে চায়নি বলেই আগেভাগে আপ্যায়ণ না করতে বলে দিয়েছিল। তবে সপ্রতিভ বলেছিল, স্রেফ এক কাপ চা। বাকি অন্য একদিন হবে।

সুজন, রক্তিম চলে যেতে অমি কেন জানি না চুপচাপ দীর্ঘক্ষণ তোমার চেহারা বাচনভঙ্গি দৃষ্টি আচরণ ইত্যাদির সঙ্গে ওর তুলনা তারতম্য বিচারে বসেছিলাম। তোমাকে বিন্দুমাত্র খাটো করার উদ্দেশ্য না থাকলেও সত্যকে মানতেই হবে। পরক্ষণেই মনকে অন্যভাবে বুঝিয়েছি, কার সঙ্গে তোমার তুলনা? তুমি স্রষ্টা। সৃষ্টিকর্তা। ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তোমরা লেখকরা কলমের কালিতে মানুষ আর সমাজকে উন্নততর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। সত্য সুন্দরের পূজারী তোমরা। তোমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরে থাক। রবীন্দ্রনাথ যেমন নাইট উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তেমন পরিস্থিতিতে তুমিও নির্ঘাৎ তেমনটি করবে। অন্তত উদ্দেশ্যমূলক প্রদত্ত ঘোষিত কোনো পুরস্কার তুমি নিশ্চিত ফিরিয়ে দেবে।

সুজন, তুমি কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু হওয়ার চেষ্টা করলে না। সোজা অঙ্কের পথে রক্তিমের বোন সেবন্তীকে বিয়ে করলে। সেই অনুষ্ঠানে দর্পণদা যে কেন নিমন্ত্রিত হল না তা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। আমাকে বাদ দিয়ে একা ওকে কি করে সম্ভব!

ফেরিঘাটের আড্ডার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অনুগত নিমন্ত্রিত ছিল। সম্ভবত আয়কর-আইনজীবী ওর বাবাকে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে হিসাবটা মগজে রেখেছিলে।

অনুগত অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করেছিল, আমাদের আড্ডার পুরনো বন্ধুদের বলিসনি? কাউকে দেখছি নাতো!

সম্ভব হয়নি। তুমি নিঃসঙ্কোচে বলেছিলে, নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা অনেক চেষ্টায় পাঁচশতে রেখেছি।

তাই বলে দর্পণ পর্যন্ত ছাঁটাই! আমাকেও অনায়াসে বাদ দিতে পারতিস।

অনু, তুই বড্ড বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছিস। বিব্রত তুমি অনুরোধ জানিয়েছিলে, আনন্দ পরিবেশটা নষ্ট করে দিস না, প্লীজ।

অনুগত আর কথা বাড়ায়নি। পরে দর্পণদাকে বলেছে, সুজনটা দিনকে দিন বড্ড ধান্দাবাজ হয়ে যাচ্ছে। বেছে বেছে প্রকাশনা পত্রিকা আর শিল্পজগতের কেষ্টবিষ্টুদের নিমন্ত্রণ করেছে। টিভি সিরিয়াল নির্মাতা রমাকান্ত নন্দীকেও দেখলাম। সুজনের যত ব্যস্ততা ওদেরকে নিয়েই। ওদের সঙ্গে নিয়ে ভিডিও ক্যামেরার সামনে কতরকম না পোজ! সত্যি বলতে কি নিজেকে ভীষণ বোকা আর ফালতু মনে হচ্ছিল। আগে জানলে যেত কোন শ্লা।

অনুগত যে তোমাকে মিথ্যা ধান্ধাবাজ বলেনি তার প্রমাণ পেলাম কিছুদিন পরে।

তোমার প্রথম উপন্যাস আর গল্পসংকলন বের হল, রক্তিমদের প্রকাশনা সংস্থা থেকে। তুমি নয়, দু'খানা বই রক্তিম পাঠিয়েছিল দর্পণদাকে। দেখলাম, উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছো তোমার প্রয়াত বাবা মাকে। আর গল্প সংকলন গ্রন্থটি নামী সাহিত্য পত্রিকা 'বিরল' এর প্রখ্যাত সম্পাদক শ্রদ্ধের সুনন্দ চট্টোপাধ্যায়কে।

এর কিছুকাল পরে তুমি এ্যাড এজেন্সির চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে 'বিরল' পত্রিকার কার্যকরি সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলে।

নতুন চাকরিতে শুধু বেতন বৃদ্ধিই যে হল তা নয়। পেলে, মারুতি গাড়ি। লবণ হ্রদে সৌখিন ফ্লাট, ফোন, টিভি আসবাবপত্র ইত্যাদি। সেই সঙ্গে অবশ্যই সর্বক্ষণের সঙ্গী সেলফোন। আরও কত কি যে বাড়তি সুযোগ সুবিধা!

তারপর আরও বিস্ময়।

দর্পণদাকে পোস্টকার্ডে লিখে অনুগত জানাল, সুজনের উপন্যাস নিয়ে রমাকান্ত নন্দীর প্রয়োজনায় টিভি সিরিয়াল 'বন্ধন' দেখানো শুরু হচ্ছে আগামী বিশ তারিখ থেকে। সকাল সাড়ে দশটার শ্লটে। শুধু রবিবার। সেদিন তোর তো ছুটি থাকে।

সুজন, অনুগত যে চ্যানেলের উল্লেখ করেছিল তা ছিল আমাদের সাদা কালো টিভির এক্তিয়ারের বাইরে। তা ছাড়া, আমাদের কেবল লাইনও দেওয়া ছিল না। তবু অদ্ভুত এক আকর্ষণে আমি পাশের বাড়িতে গিয়ে তোমার উপন্যাসের চলমান চিত্ররূপ দেখতাম।

'বন্ধন' সিরিয়ালটা আমার খুউব ভালো লাগার নাভিমূলে বিশেষ একটি কারণ

ছিল। উপন্যাসটি লিখতে আমিই তো প্রেরণা জুগিয়েছিলাম। শুধু কি তাই? তোমার প্রথম পর্বের বেশ কিছু গল্প তো আমাদের দু'জনের গোপন সম্পর্ক অবলম্বনে লেখা।

সেই সময় তুমি মিষ্টি মধুর সুনির্বাচিত শব্দ বাক্যে আমাকে অনেক চিঠি লিখতে। গোপনে পড়তে দিতে। তারপর নিষ্ঠুরভাবে ফেরত নিয়ে যেতে। আমার দারুণ কষ্ট হতো। অবাক হলেও বুঝতাম, ওই চিঠি সুবাদে ভবিষ্যতে বিপদে পড়ার ভয় পেতে তুমি। বুঝেও তোমাকে কিছু বলতাম না। তাতে অমন সুখকর চিঠি পাওয়া বন্ধ হয়ে যেত যে।

ভালোবাসা আর কাকে বলে। তুমি হয়তো জান না যে তোমার বর্ণিত নায়িকাদের যে যে গুণ আমার ছিল না সেগুলি আমি অর্জন করবার চেষ্টা করতাম। সচেতন সতর্ক থাকতাম ওদের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে। পোষাক প্রসাধন আচরণে হয়ে উঠতে চাইতাম তোমার কল্পিত শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্যময়ী নারী চরিত্রগুলির মতো।

সুজন, দুর্বল অর্থকরী কারণে আমার পক্ষে কলেজ পেরিয়ে আর উচ্চ শিক্ষালয়ের ছাত্রী হওয়া সম্ভব হয়নি। তাই বলে পড়াশুনো কিন্তু থেমে থাকেনি। প্রথম শ্রেণির লাইব্রেরিতে বসে সেই সুযোগ আমি নিয়েছি।

তখন আমরা তিনজন। দর্পণদা আমি আর কল্পিতা।

কল্পিতা কে?

বস্তিবাসিনী অষ্টাদশী একটি মেয়ে। মাতৃহীনা। ওর বাবা ভগবানের বৃত্তি ছিল, রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ের কাজ করা।

ঈশ্বর দেবতা ভগবানে কল্পিতার বিশ্বাস ছিল না। সে আকাশ কুসুম রঙিন কল্পনা আর স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসত। কেননা, আর্থিক দৈন্যতা ওর যৌবন দীপ্তিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। ভগবান এমনিতেই রোজ কাজ জোটাতে পারতো না। সংসার খরচ চালানো দায় ছিল। যৌবনবতী কল্পিতার খোরাক মেটাবে কেমন করে!

তারপর অশিক্ষিত শ্রমিকের যেসব দোষ থেকে থাকে ভগবান সেসব থেকে মুক্ত ছিল না। ফলশ্রুতি, বুকের ব্যামোতো ছিলই। সেই সঙ্গে লিভার দুর্বল রোগে আক্রান্ত হল। চিকিৎসার টাকা আসবে কোত্থেকে? কল্পিতা ভাবনায় পড়ল। কপর্দকশূন্যতা থেকে বেরিয়ে আসার নানা পথ খুঁজল। কিছুতেই কিছু হল না।

কল্পিতা শেষমেশ ভাবল, আর কিছু না হোক গতর তো আছে। সেই গতরকেই ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সুজন, তুমি যা ভাবছো তা কিন্তু নয়। কল্পিতা তোমাদের ভাষার সেই শ্রেণির কর্মী হওয়ার সহজ পথ বেছে নেয়নি। পরিবর্তে, আকাশ কুসুম কল্পনা ছেড়ে বাস্তবকে মেনে নিতে চেয়েছে। স্থির সিদ্ধান্ত নিল, ভগবানের বিকল্প হিসেবে জোগাড়ের কাজই করবো।

কল্পিতা রাজমিস্ত্রী দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বিস্তারিত জানিয়ে ভগবানের হয়ে কাজ করতে চাইল।

কাজ দেয়া তো আমার হাতে না। দুর্যোধন বলল, কে কোথায় কাজ করবে তা ঠিক করে ঠিকাদার সুখলাল। লোকটা সুবিধের না। এক নম্বরের বেচরিত্তির। রক্তচোষা বাদুড়। দশ টাকা কমিশন কেটে দিন রোজের টাকা দেয়। কামিনদের বেলায় কমিশন না খেয়ে ইজ্জত লোটে।

ইজ্জত লোটা এতই সহজ! কল্পিতা রক্তচোখ দেখাল, মরদটার কছে নিয়ে চলোই না একবার। তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল।

আমি পারব না। দুর্যোধন মেজাজ হারাল, সব জেনে বুঝেও আমি তোর সব্বোনাশ হতে দিতে পারব না।

ভগবান জানলে কি বলবে আমায়। বড় ভালো মানুষ ভগবান।

বড় দরদ দেখছি। কল্পিতা খেঁকিয়ে উঠল, তো সেই ভালোমানুষটা বিনি চিকিৎসায় মরুক আর কি!

মরবে কেন?

মরবে নাতো কি? ওষুধ তো দূরের কথা পথ্য পর্যন্ত দিতে পারিনি দু'দিন। শুধু কি ভগবান একা নাকি, দানা বিনা পেটে আমিই বা বাঁচব কদ্দিন।

বটে। দুর্যোধন দুর্বল হয়ে বলল, চল তাহলে। আমার যেন দোষ ধরিস না। আগে ভাগে বিপদ বিষয়ে জানালাম তো তোকে।

সুখলাল নির্মীয়মান একটি বহুতল বাড়ির ত্রিতলের কোণের ঘরে অসময়ে মদ্যপান করছিল। দুর্যোধনের সঙ্গে অপরিচিতা কল্পিতাকে দেখে অপ্রস্তুত হল। জিজ্ঞেস করল, ছুক্‌রি কে?

আমার জোগাড়ে ভগবানের মেয়ে।

তো ভগবানের খবর কি?

জন্ডিশ হয়েছে। বেটিকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে।

এরপর দুর্যোধন নিচু স্বরে সুখলালের কানে কি সব বলল বোঝাল কল্পিতার মালুম হল না।

সুখলাল তির্যক চোখে কল্পিতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। তারপর ইশারায় কাছে ডাকল। কল্পিতা ধুকপুকানি বুকে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সুখলাল ট্যাঁক থেকে টাকা নিয়ে হাত বাড়াল, রাখো।

এ্যাত টাকা কিসের জন্য? সন্দেহ শঙ্কিতা কল্পিতা জানতে চাইল।

রেখে দে! সুখলালের হয়ে দুর্যোধন বলল, ঠিকাদার দয়ার সাগর। তোর বাপের চিকিৎসার জন্য দিল।

আর আমার কাজ?

পাক্কা। সুখলাল একগাল হেসে বলল, বিমার-বাপকে ফেলে তু এখানে কাম করলে চলবে? তু হররোজ টিফিন টাইমে হামার খানা লিয়ে আসবি। বহুত কুছ আনতে হোবে না। সিরিফ ভাত ডাল মছলি। যেদিন বলব, মান্‌সো চাপাটি লেকিন্‌ খানা উনা পাকাতে জানিস তো?

কল্পিতা সলজ্জ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

পরদিন কল্পিতা দুরু দুরু বুকে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির। এই সময় সব মিস্ত্রী জোগাড়েরা টিফিনে যায়। টিফিনের নামে অনেকে দুপুরের আহার করে। কিছু সময় বিশ্রাম নেয়। তারপর কাজে ফিরে আসে।

এখন ধারে কাছে কোনো মানুষজন নেই। সুনশান গা ছমছম পরিবেশ। একের পর এক বিস্তর সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে ভয়ার্ত কল্পিতা বেশ ক্লান্ত।

সুখলাল প্রস্তুত হয়েই ছিল। কল্পিতাকে দেখে খুশি ঝলমল হাসল। সাদরে কাছে ডেকে বলল, লে আয়া তু? রাখ। বহুত ভুখ লাগা।

কল্পিতা খাবারের পুঁটলিটা সামনে রেখে জিগ্যেস করল, খাবার জল কোথায়?

আছে আছে। সুখলাল হো হো হেসে বলল, আগে তু চুপচাপ বোস।

কল্পিতা বাধ্য মেয়ের মতো সুখলালের নির্দেশ মেনে আড়ষ্ট বসল।

এতক্ষণ মদের বোতলটা সুখলালের ভারী শরীরের আড়ালে ছিল। সুমুখে রেখে সুখলাল বলল, এই দেখ হামার পানি। এর নাম দিয়েছি মদপানি। ভগবান ভি খায়। খায় কিনা?

খায়। কল্পিতা রুক্ষ মেজাজে বলল, ওই খাওয়ার জন্যেই তো যত ব্যামো।

আরে না, না, ইয়ে হ্যায় আসলি দাওয়াই। সুখলাল পুঁটুলি খুলে খাবার সাজিয়ে জিগ্যেস করল, ভগবান এ্যাখুন কেমন আছে?

কাল আপনার টাকায় ডাক্তার দেখিয়েছি। ওষুধ পড়তে একটু ভালো।

কুনো চিন্তা নাই। সুখলাল খেতে খেতে বলল, গরীব আদমি জলদি মরে না। দেখবি ভালো হয়ে ভগবান ফির কামকাজ করবে। লেকিন তখুন তো তুই আসবি না।

আপনি বললে আসব।

আসবি! দিন রোজ কত দিতে হবে?

যা ভালো মনে করবেন।

যা দিব তু তাতেই রাজি?

হ্যাঁ। কল্পিতা সহজ হয়ে উঠল, আপনি উপকার করছেন, রাজি হব না!

যদি বলি, তুকে শাদী করে জিন্দেগী ভর তুর পাকানো খানা খাব। সুখলাল ফিচেল হেসে জিগ্যেস করল, তু তাতেও রাজি?

ধ্যেৎ। কল্পিতা নিষ্পাপ লাজুক হাসল, আপনার বিবি নাই?

ছিল। এ্যাখুন নাই। দোসরা আদমির সঙ্গে ভেগেছে। বাবু ভদ্দোরলোক আদমি।

ইস্‌স্‌।

ইরকম হামাদের হামেশা হয়। মিস্ত্রিদের ভি কুনো বিসুয়াস্ নাই। তুকে জোগাড়ের কাজ দিলাম নাতো সিজন্য।

কিজন্য?

টিফিন টাইমে কেউ না কেউ তুকে লিয়ে মজা লুটতো। তু নারাজ তো ছুট্টি। কুনো মিস্ত্রি তুকে হেলপার নিবে না।

তাই! অবাক কল্পিতা ভাবল, সুখলালের জন্য বাঁচা গেছে। দুর্যোধন মিস্ত্রীটা নির্ঘাৎ একটা শয়তান।

শাদীর জবাব তো দিলি না! সুখলাল হাত ধুয়ে জিগ্যেস করল।

বাবা জানে। কল্পিতা পুটুলি বেঁধে বলল, আমি চললাম।

ঠিক আছে। সুখলাল দিলখুশ হাসল, ভগবানের সাথ হামি বাত্‌চিত করে নেব।

সুজন, তোমরা কিন্তু কল্পিতার দেহের বর্ণনা দিতে। ওকে নগ্ন করে অশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণির ঠিকাদার সুখলালের দ্বারা ধর্ষিতা হতে দেখাতে। তারপর কল্পিতা তোমাদের কলমে আত্মঘাতিনী হতো। অথবা, চিরদিনের জন্য সুখলালের ভোগলালসার কব্জায় বন্দিনী জীবন কাটাতো। বাস্তবে কিন্তু অন্যরকম ঘটনা ঘটল।

কল্পিতা দ্বিতীয় দিনে আর সুখলালের জন্য খাবার নিয়ে যেতে পারেনি। ওই দিন রাত্রে মাফিয়া প্রমোটারের মস্তানরা ভগবানদের বস্তিতে আগুন লাগিয়েছিল। সম্পূর্ণ সুচিন্তিত পূর্ব পরিকল্পনা মতো। বস্তির মানুষেরা পালাতে পারলেও ভগবান বাঁচেনি। অসুস্থ ঘুমন্ত অবস্থায় বস্তিবাড়ির সঙ্গে জীবন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

কল্পিতা তখন কোথায়?

খুনে লুঠেরা চন্ডালদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

অনেক রাতে কল্পিতা থানায় পৌঁছল। দমকলের কর্মী জনপ্রতিনিধি আর থানার বাবুরা সে সময় শ্মশান-বস্তি অঞ্চলে সমবেত। নিম্নশ্রেণির দু'জন কর্মী শুধু থানায় উপস্থিত।

কি চাই তোর? মোটা গোঁফ আর পেল্লাই ভুঁড়িওলা জন জিগ্যেস করল।

আমার বাবা ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দিয়েছে বাবু। এখন আমি কোথায় যাব? কল্পিতা হাউমাউ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, আমাকে বাঁচান বাবুরা।

চোপ, একদম চোপ। বেঁটে বদখত্ চেহারার দ্বিতীয় জন বলল, এটা থানা। কাঁদুনির জায়গা না। সাহেব বাবুরা খবর পেয়ে সবাই ওখানেই গেছে। ওঁনারা ফিরলে যা কিছু ব্যবস্থা হবে।

কখন ফিরবেন?

তা কি করে বলব? প্রথম জন জানাল, রাত কাবার হয়েও যেতে পারে।

তাহলে আমার এখানে থাকা হবে না? অসহায় কল্পিতা ফের কান্না জুড়ল, অন্তত রাতটুকু থাকতে দিন বাবুরা। এত রাতে কোথায় যাব আমি। গুন্ডারা যে আমার পিছু নিয়েছে। আমার বড়ই বিপদ। আপনাদের পায়ে পড়ছি।

পায়ে টায়ে পড়তে হবে না। দ্বিতীয়জন ভরসা দিল, কোনো গুন্ডা ফুন্ডাও তোর কিছু করতে পারবে না। এটা থানা। এসেই যখন পড়েছিস নিশ্চিন্ত থাক। আমরা তো আছি।

খেয়েছিস কিছু? প্রথমজন জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ। রাতে খাওয়ার পর ঘুমিয়েছি, তারপরই তো আগুন লাগাল।

কে আগুন লাগিয়েছে জানিস? প্রথমজন ফের জানতে চাইল।

চোখে তো দেখিনি।

না দেখে ভালো করেছিস। দ্বিতীয়জন বুদ্ধি দিল, দেখলেও দেখিসনি বলবি। তাহলে কোনো বিপদ নেই। নৈলে ঝামেলায় পড়ে যাবি।

জল খাবি? প্রথমজন জানতে চাইল।

খাব বাবু। তেষ্টায় আমার জিব শুকিয়ে গেছে।

ভেতরের ঘরে চল, জল খাওয়াব। দ্বিতীয়জন কল্পিতার হাত ধরে টেনে তুলল। তারপর প্রথমজনের সঙ্গে নির্বাক চোখের ভাষায় কিসব আলোচনা সারল। কল্পিতা ভয় পেল। বুঝতে পারল, ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। ওরা আসলে রক্ষকের ভূমিকায় ভক্ষক। এখানেও নিরাপত্তা নেই। অতএব অসতর্ক মুহূর্তে হাত ছাড়িয়ে দে দৌড়।

অন্ধকারে দিশাহীন ছুটতে ছুটতে কল্পিতার দীর্ঘসময় কেটে গেল। তারপর শেষ রাত্রে পরিচিত এক রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে পৌঁছাল। বেশ কয়েকবার কারাঘাত করার পর উন্মুক্ত দরজায় দাঁড়িয়ে কল্পিতার চক্ষু চড়কগাছ। বিস্ময়ে হতবাক। এ কি দৃশ্য দেখছে সে! এ যে বাঘ গরুতে জল খাচ্ছে একঘাটে। বস্তি-শ্মশান ফেরত ক্লান্তি দূরীকরণে সবাই নেশায় টইটম্বুর।

একজন দু'হাত বাড়িয়ে বলল, এ যে দেখছি মেঘ না চাইতে জল।

অপরজন পরমাদরে ডাকল, আয় মা আয়।

ধুস্। তৃতীয়জন বলল, কি যা তা বলছিস? মাতাল আর কাকে বলে। কান্ডজ্ঞানটুকু নেই! বল, এসো বধু সুন্দরী। ওগো মোর প্রাণপ্রিয়া।

অথবা বলো, এসো এসো আমার ঘরে। বিকৃত সুরে গাইলে একজন। তারপর কল্পিতার দিকে এগিয়ে এসে বলল, তুমি এলে অনেক দিন পরে যেন বৃষ্টি এলো।

কল্পিতা চিবুক থেকে মাতালের হাত সরিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর দে ছুট্। ভোরের আবছা আলোয় সুমুখে যার সঙ্গে ধাক্কা খেল সেই ব্যক্তি হল দর্পণদা।

দর্পণদার নাইট ডিউটি ছিল। হঠাৎই সেদিন কেন যে ইচ্ছে হয়েছিল, ভোরের

নরম হাওয়ায় হলুদ রোদ্দুর গায়ে মেখে কোলকাতা হাওড়া ব্রিজ নদী আকাশ দেখবে। বুক ভরে নির্মল বাতাস নেবে। পায়ে হাঁটবে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত। ক্ষ্যাপামি আর কাকে বলে?

সুজন, লেখকরা এমনতর ক্ষ্যাপা হয় কিনা তুমি হয়তো জানবে।

নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে কল্পিতা কি বলেছিল জান? বলেছিল, এতদিন আমি দেবতা ভগবান আছে বিশ্বাস করতাম না। এখন মানছি, তুমি সাক্ষাৎ দেবতা।

কল্পিতাকে নিয়ে দর্পণদা একটা সুন্দর গল্প লিখেছিল। নাম দিয়েছিল 'ঈশ্বরপুত্রী'। তুমিও অনেকটা এরকম এক ভাগ্যতাড়িতা মেয়ের নির্মম জীবনের প্রতি দরদ দেখিয়ে একটা গল্প লিখেছিলে। নাম দিয়েছিলে 'যৌনদাসী'।

দর্পণদা 'ঈশ্বরপুত্রী'-র পান্ডুলিপি পড়ে অনুগত বলল, এত সুন্দর গল্পটা লিটল ম্যাগাজিনে দিস না।

লিটল ম্যাগাজিন ক'জন আর পড়ে। অনুগতর সমর্থনে আমি বললাম, নাম যশ পরিচিতির জন্য সার্কুলেশন বেশি এমন নামী পত্রিকায় লেখা ছাপা হওয়া দরকার।

ছাপলে তবে তো। দর্পণদা নিরুত্তাপ বলল।

দিয়ে দেখেছিস কখনও? অনুগত জানতে চাইল।

আসলে তুমি যেন যেমন চলছে চলুক গোছের। আমি আরও আক্রমণাত্মক বাক্য ব্যবহার করলাম, ভীষণ আলস্য তোমার। উৎসাহটা বড্ড কম।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। দর্পণদা আত্মপক্ষ সমর্থনে বলল, আজকের লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ অত সহজ নয়। অতীতে সম্পাদকেরা উৎকৃষ্ট লেখা খুঁজতেন। অখ্যাত পত্রিকায় তেমন কোনো লেখা পড়লে অপরিচিত লেখককেও সাদরে ডেকে পাঠাতেন। লেখা দিতে বলতেন। ডাকযোগে যেসব লেখা আসত সেগুলিও মন দিয়ে পড়তেন। প্রয়োজনে অল্পবিস্তর কলম চালিয়ে ছাপতেন।

আর এখন? অনুগত জানতে চাইল।

বিখ্যাতদের এত লেখা আগাম জমা পড়ে থাকে যে ওসবের আর দরকার হয় না। ওই জমে থাকা বিস্তর লেখাগুলিও লাইন বেলাইনে আগে পরে ছাপার ব্যাপারে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়।

শুনেছি, ডাকযোগে লেখাগুলি পাইনি বলে পড়েই না। আমি প্রশ্ন জুড়লাম, কিন্তু তুমি যদি সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে ওর হাতে লেখাটা জমা দাও?

সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কি অতই সহজ নাকি। দর্পণদা ওর অভিজ্ঞতার পাতা মেলে ধরল, নামী দামী পত্রিকার সম্পাদক দপ্তরের চালচরিত্র উনিশ বিশ। আজকাল অনেক অফিসে ঢুকতে গেলে গেটে বাধা। তারপর রিসেপশনে বাধা। তৃতীয় স্তরে বিভাগীয় দপ্তরের দরজার বাধা। এতরকম বাধা স্থলে হরেক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে তবেই সম্পাদক দর্শনের অনুমোদন মেলে। অনেক অফিসের

রিসেপশনে যদি জানতে পারে যে, লেখা জমা দেয়াই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য তাহলেই বলবে, এখানে দিয়ে যান। ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে।

আর যদি লেখা জমা দেয়া উদ্দেশ্যটা গোপন রাখা যায়?

কারণ কিছু বলতে হবে একটা। বিশ্বাসযোগ্য মনে হলে ভালো। নৈলে ফোনে সম্পাদকের কাছ থেকে অনুমোদন চেয়ে নেবে। তারপর তৃতীয় গাঁটের দরজায় অপেক্ষা করতে হবে। সম্পাদক প্রবেশ অনুমোদন করলে তবেই সাক্ষাৎ মুখোমুখি হওয়া যায়।

তোর তেমন সুযোগ কি হয়েছে কখনও? অনুগত এমনভাবে প্রশ্ন করল যেন রহস্য গল্পের শেষাংশটুকুতে পৌঁছে গেছে।

অভিজ্ঞতা না থাকলে বলছি কেমন করে? দর্পণদা একবার এক পত্রিকায় লেখা জমা দেয়ার অভিজ্ঞতা শোনাল। গল্প জমা দিতে চাই শুনে সম্পাদক মহাশয় বললেন, যিনি গল্প পড়ে দেখেন ওর হাতে দিন। বলেই কাঁচঘর থেকে অদূরে দক্ষিণের এক টেবিলের দিকে হাত দেখালেন।

গেলাম সেই টেবিলে। যত্নের দাড়ি রুখুসুখু চুল আর হালফিল ফ্রেমের চশমায় আঁতেল সেজে তিনি গল্প নির্বাচকের চেয়ারে বসে পাণ্ডুলিপি পড়ছিলেন। আমার দিকে চোখ তুলে উদাসী তাকালেন।

আমি আসার আগমন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম।

লেখা এনে থাকলে দিন। গল্প নির্বাচক বললেন।

বসতে বলার সৌজন্য না দেখালেও ওর সুমুখ চেয়ারে বসলাম। ঝুলি থেকে বের করে লেখাটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, আপনার নামটা জানতে পারি কি?

অভ্রান্ত রায়।

আপনিও গল্প লেখেন। ইদানিং অনেক কাগজেই আপনার লেখা দেখছি।

আগেও অনেক লেখা বেরিয়েছে, তবে অন্য নামে। অভ্রান্ত রায় আমার গল্পের পাণ্ডুলিপির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, তখন আমি পত্রিকা অফিসে কাজ করতাম না।

অন্য নামে লিখতেন কেন জানাতে আপত্তি আছে?

অন্য নাম নয়। অভ্রান্ত রায় কি যেন হিসেব করছিলেন। বললেন, বিমল ভূষণ রায়চৌধুরী নামটা বড্ড বড়। ছোট করে বিমল রায় বা বিমল চৌধুরী নাম করলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো তাই।

ঠিকই করেছেন। আজকের দিনে নামটাও একটা ফ্যাক্টর। কুমার শানুর আসল নামটা ভাবুন তো একবার।

আপনার নামটা কিন্তু সুনির্বাচিত।

অনেকেই বলে। অভ্রান্ত দুর্বোধ্য হাসলেন। তারপর আমার পাণ্ডুলিপিটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমাদের নির্দ্ধারিত শব্দের চাইতে অনেক বেশি হয়ে গেছে। আরও ছোট গল্প দেবেন।

তারপর তুমি ছোট গল্প নিয়ে যেতে কি হল বল। আমিও অনুগতর মতো জানতে আগ্রহী হলাম।

আমি আর যাইনি।

কেন যাওনি? ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠে আমি বললাম, ওরা তো অন্যায় কিছু বলেনি।

ওরা ওদের মতো বলেছে। আমি আমার মতো চলছি। চেষ্টা করে দেখেছি, ওভাবে শব্দ বাক্য পাতা গুণে রসোতীর্ণ কোনো গল্প লেখা সম্ভব নয়। অনেকে ভাবতে ভাবতে লেখে। কেউবা লিখতে লিখতে ভাবে। অনেকে শেষটা কি হবে আগেই ভেবে রেখে লেখা শুরু করে। এমন লেখকও আছে যারা লেখা শুরু করার সময় জানে না শেষটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তো শব্দ বাক্য পাতার আগাম হিসেব মিলবে কেমন করে? এই সমস্যাটা আমারও আছে।

বুঝলাম। অনুগত যুক্তিযুক্ত বলল, যে লেখাটা নিয়ে গিয়েছিলি সেটাই তো নিজের হাতে কাঁটছাট এডিটিং-এ ছোট করতে পারতিস। ওদের হিসেব মতো হয়ে যেত।

সে চেষ্টাও করেছিলাম, ব্যর্থ হয়েছি। যে কোনো একটা লেখা অনেক কষ্টের ফসল। প্রতিটি শব্দ প্রয়োগ বাক্য গঠন যথাযথ ভাবনা নির্ভর হয়ে থাকে। কত আর কাটাকুটি সম্ভব!

সুজন, তোমাদের 'বিরল' পত্রিকা অফিসেও দর্পণদা একবার লেখা নিয়ে গিয়েছিল। তখন তুমি ওই কাগজে কাজ করতে না। তুমি আসাতেও নিশ্চয়ই সেই আচরণ পাল্টায়নি। তোমার আসনটিতে সেই সময় যিনি বসতেন তিনি ওর হাত থেকে খামে ভরা লেখাটা নিয়ে শ্রুতিকটু স্বরে বললেন, ঠিক আছে। পরে খোঁজ নেবেন।

দর্পণদার হাতে তেমন সময় কোথায়? বিশেষ করে অফিস টাইমে। তা ছাড়া, যাতায়াতে অর্থ খরচও তো হয়। তাই সবিনয়ে জিগ্যেস করল, লেখাটা মনোনীত হলে ডাকযোগে জানাবেন নিশ্চয়ই?

আজকাল আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। সম্পাদক মহাশয় বললেন, তা ছাড়া ডাকবিভাগের যা বেহাল অবস্থা এখন। বিশ্বাস রাখা যায় না। তার চাইতে নিজে খোঁজ নেয়া ভালো।

তাই হবে। দর্পণদা জানতে চাইল, কতদিন পর আসতে বলছেন।

এই ধরুন একমাস।

অখ্যাত লেখকের কাছে এই সময়টা প্রহর দিন গোনার উত্তেজনায় যেন এক বছর।

দর্পণদা একমাস পর খোঁজ নিতে গিয়েছিল।

সম্পাদক মহাশয় বললেন, এখনও পড়া হয়নি। এবার পড়ব। আর কিছুদিন পর আসুন।

দর্পণদা কিছুদিন পর অর্থে আরও একমাস পরে গিয়েছিল। সম্পাদক মহাশয় সে সময় গুণমুগ্ধ ক'জন ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করছিলেন। অনেকটা সময় দর্পণদাকে নির্বাক বসে থাকতে হল।

আপনি বলবেন কিছু? গুণমুগ্ধরা চলে যাওয়ার পর সম্পাদক মহাশয় জানতে চাইলেন।

আমার গল্পটা পড়া হয়েছে কিনা জানতে এসেছি। দর্পণদা নিরুদ্বেগ বলল, দু'মাস হয়েছে জমা দিয়েছি। আপনি খোঁজ নিতে বলেছিলেন, তাই—

দু'মাস? তাহলে এখনও দেখা হয়নি। এত লেখা জমে আছে যে কি বলব। আপনি বরং আর একদিন সময় করে আসুন।

দর্পণদা প্রথমে স্থির করেছিল আর ওমুখো হবে না। চার মাস অন্তে ভাবল, পাণ্ডুলিপিটা যদি ফেরত পাওয়া যায়। তাই গিয়েছিল।

কি নাম ছিল আপনার গল্পের? সম্পাদক মহাশয় জানতে চাইলেন।

দর্পণদা নামটা বলতে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, মনে পড়ছে না।

কতদিন হল জমা দিয়েছেন?

দর্পণদা জমা দেয়ার তারিখটা বলল।

চার মাস পেরিয়ে গেছে! সাধারণত তিন মাসের মধ্যেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। তাহলে ধরে নিতে হবে লেখাটা মনোনীত হয়নি। আপনি আরেকটা লেখা দিন।

এই পাণ্ডুলিপিটা ফেরত চাই যে। দর্পণদা প্রয়োজনের কারণ ব্যাখ্যা করল, কোনো পত্রিকাই তো জেরক্স কপি নেয় না। অরিজিনাল চাই। এই অরিজিনালটাই অন্য কোথাও জমা দেয়া যাবে।

সে তো পাবেন না।

কেন? দর্পনদা স্বভাববিরুদ্ধ উত্তেজিত হল, ছাপা যদি নাই হবে আমার হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি কেন আপনাদের দখলে থাকবে? ওটা আমার মস্তিষ্ক শ্রম কলম কালি কাগজের সমন্বয়ে মূল্যবান সম্পত্তি।

এমন প্রশ্ন আপনিই প্রথম কেন তুলছেন জানি না। দখলে তো থাকে না। জায়গার অভাবে সব নষ্ট করে ফেলা হয়।

সেটা আপনাদের অনধিকার অন্যায় কাজ হয়।

এরপর দর্পণদা আর একমুহূর্ত সেখানে থাকেনি।

সুজন, এই ঘটনা শুনে দর্পণদাকে জিগ্যেস করেছিলাম, তোমার লেখা কি ওরা আদৌ পড়েছিল?

জানব কেমন করে? দর্পণদা ম্লান হাসল। তারপর অন্য একদিনের অভিজ্ঞতার কথা জানাল, নামটা বলব না। বিখ্যাত এক সম্পাদকের টেবিলের সুমুখ-চেয়ারে বসে আছি। আসার আগে থেকেই বয়স্ক এক ভদ্রলোকও সম্পাদকের মুখোমুখি বসেছিলেন। বলছিলেন, তুমি আমাদের গাঁয়ের গর্ব। আজ এতবড় হয়েছো। সর্বত্র তোমার নামযশ। এমন একটি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছো। আমি দীর্ঘকাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছি। এখন অফুরন্ত সময়। দেশ বিদেশের নানান বই পড়ে বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতার বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দীর্ঘকাল ধরে লিখে একটি প্রবন্ধ শেষ করেছি। জানি না কতটা সফল হয়েছি। তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম। তুমি ব্যস্ত মানুষ তবু যদি সময় করে একটু পড়ে দেখ। ছাপতে বলছি না। অন্তত পড়ে একটু মতামত জানালে খুশি হব।

নিশ্চয়ই পড়ে দেখব। সম্পাদক বিনয়ের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তারপর? অনুগত শেষটুকু শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হল।

বয়স্ক ভদ্রলোক পরম আহ্লাদিত হয়ে চলে গেলেন। ওঁর প্রস্থানের পরই আমার সুমুখেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটতে দেখলাম।

সেটা কি বলবি তো। গল্পকারদের এই এক অনবদ্য অভ্যাস। সাসপেন্স ক্রিয়েট করে রাখা। তারপর অভাবনীয় দে ধাক্কা।

সত্যিই সেদিন আমিও ভীষণ ধাক্কা খেয়ে নিজের লেখাটা আর জমা দেয়া উচিত মনে করিনি। বয়স্ক সেই প্রধান শিক্ষক চলে যাওয়ার পর মুহূর্তে মাননীয় সম্পাদক মহাশয় খামবন্ধ প্রবন্ধটি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছিলেন।

তুমি লেখা না হয় দিলে না। আমি সন্দিগ্ধ মনে জানতে চাইলাম, কিন্তু কিছু না বলেই সোজা উঠে চলে এলে? সম্পাদক জানতে চাইলেন না যে তুমি কেন গিয়েছিলে?

জানতে চাওয়ার আগেই জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, আজকের অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখকের কলমেই জানতে পারি যে আপনি পাকা জহুরী। প্রতিভাবানদের ঠিক চিনে নেন এবং লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেন। আমি আপনার কাছে এসেছি অন্য কারণে।

সেই কারণটা কি? সম্পাদক মহাশয় জানতে চাইলেন।

আমি লিটল ম্যাগাজিনে লিখি। আপনার কাছে পরামর্শ চাইছি রসোত্তীর্ণ ভালো গল্প লিখতে হলে আমার কি রকম পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার?

কি উপদেশ দিলেন তিনি? অনুগত কিছুটা নাটকের ঢঙে বলল।

বললেন, প্রথমত, গল্পটা লেখার পর বন্ধু মহলে পড়ে শোনাতে হবে। ওদের মতামত সমালোচনা শুনে প্রয়োজনে সংশোধন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রচুর বিদেশি সাহিত্য পড়তে হবে। তৃতীয়ত, লেখার সময় পাঠক পাঠিকাদের স্মরণে রাখতে হবে।

সুজন, তুমি কোনো একটি পত্রিকার সাক্ষাৎকারে বলেছিলে যে, আমি এখন পর্যন্ত এমন কিছু কালজয়ী লেখা লিখতে পারিনি। খুউব উচ্চমানের লেখক বলেও নিজেকে মনে করি না। তবু, আমার লেখার যে এত চাহিদা তার পিছনে বিশেষ একটা কারণ আছে।

কি সেই কারণটা? তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

তুমি বলেছিলে, সেটা গোপন রাখতে চাই। টপ সিক্রেট।

সুজন, সেই টপ সিক্রেসিটা কি দর্পণদাকে দেয়া তিন টেক্কা পরামর্শ তা জানি না। জানবার সুযোগও নেই। তবে রসিক পাঠিকা হিসেবে এটুকু বুঝি, এখনকার গল্প উপন্যাসগুলি লেখার সময় তুমি বিদগ্ধদের চাইতে সিংহভাগ সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের চাহিদাটা মগজে বেশি রাখ। তুমি অনেক অনেক বিদেশি সাহিত্য পড়। তোমার লেখাতেও সে সবের এমন সুসংমিশ্রণ থাকে যে টের পাওয়া মুশকিল।

তা ছাড়া, এ দেশের অধিকাংশ পাঠক পাঠিকারা সাধারণত যে কোনো একটি ভাষায় লিখিত সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত। এই বিভাজনটা বিশেষভাবে ইংরেজি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার বেলায় প্রযোজ্য। সুতরাং, কোনো ইংরেজি সাহিত্য থেকে তোমার বাংলা লেখায় মিশ্রণ ঘটিয়েছো তা একমাত্র উভয় সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহালদের কাছেই মালুম হওয়া সম্ভব।

চলতি বাংলায় একটা কথা প্রচলিত আছে। সেটা হল, জনগণ কোনটা খাবে ভালো। সিনেমা নাটক সাহিত্য সংগীত ইত্যাদি সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই খাওয়া আর খাওয়ানোর বিষয়টা একটা বিশেষ আর্ট বা প্রতিভার পরিচয়। বিপরীতে অন্য ধারা। বিক্রেতা হামেশা বলে, নিয়ে যান। এটাই এখন বাজারে দারুণ চলছে। এই চলছে বলে ক্রেতার রুচি তৈরি করছে বিক্রেতা। সে যাই হোক, তোমরাও তো গরম গরম বাজারই চাও। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। পুজোর সময় যেমন একাধিক গল্প উপন্যাস নভেলেট তোমাদেরকে সরবরাহ করতেই হয়। না হোক সেগুলি যথার্থ রসোত্তীর্ণ অথবা যোগ্য পদবাচ্য।

সুজন, শুধু কি বিদেশী সাহিত্য থেকেই আমদানিতে সীমাবদ্ধ? দর্পণদা ওর একটা লেখা তোমাকে পড়ে ছাপার যোগ্য মনে হলে সুযোগ করে দিতে অনুরোধ জানিয়েছিল। রসোত্তীর্ণ যথার্থ হয়নি বলে তুমি অনেকদিন পর ফেরত দিয়েছিলে। গল্পটা ছিল ঘুড়ির প্যাঁচ খেলা লড়াই নিয়ে। অবশ্যই ওই ঘুড়ির প্যাঁচ-লড়াই নিয়ে তোমার লেখা গল্পটা দর্পণদার গল্পের চাইতে অনেক বেশি উচ্চ মানের হয়েছিল। দর্পণদার গল্পটা যদি পরবর্তীকালে কোনো লিটল ম্যাগাজিনে ছাপা হত তাহলে কি দাঁড়াত? পাঠক পাঠিকাদের কাছে দর্পণদা তোমার গল্প থেকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত হতো। তাই, দর্পণদা ওর লেখাটা ছিঁড়ে ফেলেছিল।

সুজন, তোমার নামে মজাদার একটা ঘটনা শুনেছিলাম একবার। সেটা অবশ্য

দর্পণদার মুখ থেকে শোনা নয়। লিটল ম্যাগাজিনে মোটামুটি ভালোই লেখে এমন একজন লেখক সে কিনা রক্তিমের পত্রিকা 'অনির্বাণ'-এর অন্যতম সহযোগী। খ্যাত প্রখ্যাত পত্রিকায় কে না লিখতে চায়? যেহেতু তেমন বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ সম্পর্কটা উল্লেখযোগ্য তাই বলেছিল, আপনি বললে হয়তো ওদের পত্রিকায় ছাপা হতে পারে। অনেক লেখা জমে আছে।

তুমি নাকি বলেছিলে, তোমার তো পরিচিতি নেই। সবাই পরিচিত লেখকের লেখা ছাপাতে চায়। আমার লেখার এত চাহিদা যে ইদানীং সকলের আবেদনে সাড়া দিতে পারি না। তোমার লেখা আমি পড়েছি। ভালোই তো লেখ। তবু, ওরা ছাপবে না। তুমি বরং রাজি থাকতো আমাকে দিতে পার। আমার নামে ছাপা হলে সাম্মানিক যা দক্ষিণা পাব সবটাই তোমাকে দিয়ে দেব।

সুজন, সত্যি মিথ্যা জানি না। ছেলেটি নাকি প্রত্যুত্তরে বলেছিল, আমার তো টাকার দরকার নেই। নামযশ পরিচিতিটাই প্রয়োজন।

এসব রটনা ঈর্ষান্বিত দুর্জনেদের হতে পারে। আবার তোমার মতো মানসিকতার মানুষের পক্ষে অসম্ভবও কিছু না। তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে কেমন ভাবে উপরে উঠতে হয় সেই কায়দাকানুন তুমি বেশ ভালোই আয়ত্ত করেছো। বিচারকদের উপঢৌকন দিয়ে কিভাবে পুরস্কার প্রাপক হতে হয় সেটা তুমি জান। তেমনি জান, কিভাবে স্পনসার জুগিয়ে দিয়ে সম্বর্ধিত হতে হয়। দুর্জনেরা বলে, অপরিচিত লেখকের লেখা 'বিরল' পত্রিকায় ছাপানোর সুযোগ করে দেবার বিনিময়ে তুমি নাকি প্রাপ্ত দক্ষিণা থেকে বখরাও নাও। নয়তো উপহার দ্রব্য গ্রহণ কর।

সুজন, একশ ভাগ নির্ভেজাল খবর আছে তুমি বেনামে ইদানিং একটি প্রকাশনা সংস্থাও করেছো। নতুন লেখক লেখিকাদের লোভনীয় শর্তে বই প্রকাশের আহ্বান জানানো বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপন আমারও নজরে পড়েছে। সেই বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে দৃষ্টিকটু বই বের হয় ঠিকই। কিন্তু লেখকের দেয় টাকার লভ্যাংশটুকুতে তোমার ব্যবসা বাড়লেও ওদের কোনো লাভই হয় না। কেননা লেখক বইগুলির সিকিভাগ নিলেও বাকি তৃতীয়াংশ অবিক্রিতই পড়ে থেকে নষ্ট হয়।

সুজন, তোমাকে নিয়ে এমনতর স্বপ্ন তো আমার ছিল না। আমি চেয়েছিলাম, তুমিও আর দশজন যশস্বী অসাধারণ লেখকের মতো শ্রদ্ধার পাত্র হও। স্বপ্ন ছিল, ওদের মতো পরিচ্ছন্ন মহৎ ভাবনায় মানুষকে সবরকম দীনতা কলুষতা থেকে মুক্তি দিয়ে পবিত্র স্নিগ্ধ সুবাসিত চেতনাময় রূপে সৃষ্টি করবে। তোমার কলম মূল্যবোধ ফেরাতে বিশ্বাস করতে শেখাতে আর আলোর জগতে পৌঁছে দিয়ে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

অর্থাৎ কিনা তোমার ভূমিকা হবে সমাজ সংস্কারকের।

কিন্তু, কি দেখছি আমি?

তোমার দৃষ্টি যথেষ্ট উদার গভীর নয়। ডুব দিয়ে মুক্তো তুলে আনার ক্ষমতা নেই তোমার। তুমি স্বাধীন চিন্তাহীন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার মন মানসিকতার অভাব। তোমার লেখার দর্শন অধ্যাত্ম মনস্তত্ত্ব নেই বললেই চলে। মানবিকতা আর আত্মমর্যাদাহীন লেখকের পক্ষে যথার্থ চরিত্র চিত্রণ সম্ভব হয় না। তাই তোমার লেখাতেও একঘেয়েমির বাইরে নতুনত্ব তেমন কিছু মেলে না।

সুজন, অথচ তুমি কিন্তু প্রতিষ্ঠিত লেখক। দৈনিক পত্রিকার রবিবারের সাহিত্যের পাতা সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক পত্র পত্রিকায় তোমার অজস্র লেখা বের হয়। পুজো সংখ্যাতে তো বটেই বিশেষ সংখ্যাগুলিতেও তোমার লেখা গল্প উপন্যাস থাকবেই থাকবে। নববর্ষ আর বইমেলাতে তোমার একাধিক বই প্রকাশিত হয়।

শুধু কি তাই?

তুমি এখন লেখক সমালোচক বুদ্ধিজীবী। পত্রপত্রিকা টিভিতে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার থাকে। সাহিত্য ধর্ম রাজনীতি সমাজ ক্রীড়া পরিবেশ ইত্যাদি পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে তোমার মতামত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে থাক। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ ভালোলাগা না লাগা সম্পর্কে নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাক। যে কোনো ব্যাপারেই হাঁটার যে একটা হাওয়া উঠেছে তাতেও তুমি সামিল হও। নির্বাচনে বিশেষ কোনো প্রার্থীর সমর্থনে ভোট প্রার্থনায় একগুচ্ছ স্বাক্ষরকারীর মধ্যে তোমারও নাম থাকে। উপস্থিত থাক, খরা বন্যা ভূমিকম্প যুদ্ধ ইত্যাদিতে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে। কিসে নেই তুমি? মিডিয়া তোমাকে দারুণ পছন্দ করে। আসলে সহজলভ্য তুমি সর্বযজ্ঞে একটি কদলি বিশেষ।

সুজন, তোমার লেখার ভক্তদের সংখ্যাও বিস্তর। আজকালকার পাঠক-পাঠিকারা চলচ্চিত্র তারকাদের ফ্যানদের মতো হয়ে যাচ্ছে। ওরা তোমার সাক্ষাৎ চায়। ফোন করে। চিঠি লেখে। একান্তে কাছে পেতে আশা করে। অথচ ওরা কোনো অনুষ্ঠানে তোমাকে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে পেতে চাইলে মূল্যবান সময় খরচের জন্য পারিশ্রমিক দাবি করে থাক।

এসব গোপন তথ্য কিন্তু সাধারণ মানুষ জানতেও পারে না।

অথচ, তোমাকে নিয়ে আমার স্বপ্ন কিন্তু এমনটি ছিল না। হয়তো যৌবনের প্রাথমিককালে তোমার চোখের আলোয় যা দেখেছিলাম সেটা বেঠিক ছিল। ভুলটা আমারই। তাই মনে হয়েছিল, 'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই গো'। তুমি আমার 'চির বন্ধু চির নির্ভর চির শান্তি।' অথবা 'আমার আপনার চেয়ে আপন।'

সুজন, কল্পিতা ঘর সামলাতে পারত বলেই বিজ্ঞাপন সংগ্রহের বৃত্তিটা আমার পক্ষে নেয়া সম্ভব হয়েছিল। বড্ড কষ্টকর কাজ। শারীরিক শক্তির চাইতে বাক্যক্ষয় দরকার হয় বেশি। সেই সঙ্গে চাই পোশাক প্রসাধনে নিজেকে নয়নসুখকর করে তোলা। অল্প অনুশীলনেই আমি সাফল্যের মুখ দেখতে পেলাম।

প্রথমে উপার্জনের উদ্দেশ্য ছিল, অভাব অস্বচ্ছলতা উত্তরণ। পরে হয়ে দাঁড়াল, আরও উন্নততর বিত্ত নিয়ে বেঁচে থাকা। শেষ দিকে আরও অনেক অনেক টাকার নেশায় পেয়ে বসল।

বিউটি পার্লারের দৌলতে আমি যখন সুশ্রী সুন্দরী আকর্ষণীয়া সেই সময় অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটেছিল। শীতল পানীয় প্রস্তুতকারক এক বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থায় বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। প্রচার বিভাগের প্রধান ইন্দর সিং-এর সঙ্গে আগাম এ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া ছিল। অথচ, বিশেষ জরুরি কাজে ওকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল।

এই শ্রেণির সংস্থায় কর্মসংস্কৃতি অসাধারণ অতুলনীয়। আমি অভাবনীয় অবাক হয়ে দেখলাম, মিঃ সিং অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বার্তা রেখে গেছে। লিখেছে, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ মুস্তাফীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আপনার দেয়া কাগজপত্র কনটাক্ট ফর্ম ওর কাছে আছে। রিসেপসনিস্ট মিস পামেলা দেব সমস্ত ব্যাপারটা জানে। মিস পামেলা দেব সমস্ত ব্যাপারটা জানে। মিস পামেলা আপনাকে মিঃ মুস্তাফীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবে। আশা করি, আপনাকে নিরাশ হতে হবে না।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতে মিস পামেলা অবাক করে বলল, মিস মৌমিতা?

আমি মাথা নেড়ে নির্বাক জানালাম, হ্যাঁ।

মিঃ সিং না থাকলেও কোনো অসুবিধা হবে না। জাস্ট এ মিনিট।

মিস পামেলা ইন্টার কমে আমার উপস্থিতি জানান দিল।

ওপার থেকে নির্দেশ পেয়ে একজন চাপরাশিকে ডাকল। বলল, মেমসাবকে মুস্তাফী সাহেবের কাছে নিয়ে যাও। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল, যান। উইশ ইউ গুড লাক।

মিঃ মুস্তাফীর চেম্বারটা সেই রকম সৌখিন সাজানো যেমনটি এই শ্রেণির সংস্থায় হয়ে থাকে। বৃত্তিসূত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় বিস্ময়াভিভূত হলাম না।

বিস্ময়টা অন্যত্র। কল্পনায় হোঁচট খেলাম।

পোশাকে কেতাদস্তুর হলেও মিঃ মুস্তাফীর শারীরিক গঠন মুখশ্রী অতি সাধারণ। পদমর্যাদা অনুযায়ী মানানসই ব্যক্তিত্বসম্পন্নও দেখতে নয়।

মিঃ মুস্তাফী ফোনে ব্যস্ত ছিল। ডান হাতের ইশারায় আমাকে সুমুখ চেয়ারে বসতে বলল। নিজে ফোনে বাক্যালাপে ডুবে রইল।

আমি নির্দেশিত আসন গ্রহণ করলাম। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রুম ফ্রেসার সুবাসিত আবহাওয়ায় আরাম বোধ হল।

অনেকক্ষণ হল। মিঃ মুস্তাফীর ফোনালোচনা যেন শেষ হতেই চায় না।

অস্বস্তি কাটাতে বাধ্য হয়ে আমি চেম্বারের চারদিকে নজর ছোটালাম।

নিষ্প্রয়োজন নিরীক্ষণ করলাম। কিন্তু তাতে আর কতটুকু সময় কাটানো যায়।

কে একজন এসে আমার সুমুখে সৌখিন পেয়ালায় চা রেখে গেল। জানি না এটা রেওয়াজ নাকি পূর্ব নির্দ্ধারিত। কেননা, আমি আসার পর মিঃ মুস্তাফী এমন কোনো নির্দেশ দেওয়ার ফুরসত্ পেল কোথায়। মিঃ মুস্তাফী পুনরায় ইশারায় আমাকে চা পান শুরু করতে বলল।

আমার দৃষ্টি সেই যে পেয়ালায় আনত হল আর উঠল না। সেই সুযোগে দু'কান সজাগ হল। চুমুকে চা পান। শ্রবণে উৎসুক্য। মনকে প্রবোধ, ধৈর্য ধর। এসব কাজে সফল হতে গেলে পরিবেশ পরিস্থিতি অনেক কিছু মেনে মানিয়ে নিতে হয়।

মিঃ মুস্তাফীকে বলতে শুনলাম, এমন কিছু অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ থাকে যেখানে সস্ত্রীক না গেলে নিজেকে হেয় হতে হয়। যুগলে উপস্থিতিটা সভ্যতা ভদ্রতাবোধের মধ্যে পড়ে। এই সরল সত্যটা তুমি আজ পর্যন্ত বুঝলে না। জানি না, কোথায় তোমার বাধা। পাটনা চেন্নাই-এ থাকাকালে তবু একটা অজুহাত দেখানো যেত। কিন্তু এখন কোলকাতায়? এখানকার অবাঙালী সম্প্রদায়ও মোটামুটি বাংলা ভাষায় অভ্যস্ত। এখানে কি অজুহাত দেখাব? প্লীজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এখনও সময় আছে। নিজেকে পাল্টাবার চেষ্টা কর। ও কে।

মিঃ মুস্তাফী রাগত রিসিভারটা শব্দ করে রাখল। তিন সেকেন্ড দাঁত কিড়মিড় বিড়বিড় করল।

আমি ওর দিকে দৃষ্টি মেলে আছি নজরে পড়াতে লজ্জা সামলে স্বাভাবিক হল।

স্যরি ম্যাডাম। নিমেষে বদলে গিয়ে স্মার্ট বাকপটু মিঃ মুস্তাফী বলল, আপনার বেশ কিছুটা ভ্যালুয়েবল সময় নষ্ট করে দিলাম। আসলে, আমার হোম মিনিস্টার অর্থাৎ মিসেসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সিরিয়াস টক।

আমিও তাই অনুমান করেছি। আমি দুষ্টু মিষ্টি হাসলাম।

আর কি কি অনুমান করতে পেরেছেন?

বিশেষ কোনো ইজ্জতদার অনুষ্ঠানে দু'জনে একসঙ্গে যাওয়া দরকার। অথচ মিসেস কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছেন না।

ঠিক ধরেছেন। আর কিছু অনুমান?

নাথিং মোর। আপনার শেষের সংলাপটুকু যা কানে এসেছে।

আসলে কি জানেন, আমার মিসেস দারুণ জেদি। এর 'না' কে কিছুতেই 'হ্যাঁ' করানো যায় না। ভীষণ অবুঝ মন। এমনিতে বেশ খোলামেলা শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু রেগে গেলে মাথা ঠিক থাকে না। উল্টাসিধা অনেক অপ্রিয় কথা বলে বসে। পরে অবশ্য অনুতপ্তও হয়।

এসব আপনার ব্যক্তিগত ঘরোয়া ব্যাপার। আমি আমার কাজ হাসিল করে বিদেয় নিতে বললাম, এসব প্রবলেম আমাকে নাই বা বললেন।

বলছি আপনিও একজন নারী বলে। আপনারা তো পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। পুরুষদের প্রভুত্ববাসনার বিরুদ্ধে হামেশা প্রতিবাদ মুখর। চশার ওঁর 'ওয়াইফ অব বাথ্'-এ বলেছিলেন, 'নারীজীবনে সবচাইতে বেশি চায় প্রেমিক পুরুষটির ওপর শর্তহীন প্রভুত্ব আর প্রণয়ীর নিঃশর্ত দাসখৎ—।' তো তেমনটিই তো মেনে নিয়েছি। তবু, কেন যে ঝামেলা পাকায় বুঝি না। আই এ্যাম রিয়েলি ফেড আপ।

আপনি ডিসটার্ব আছেন। এড়িয়ে যেতে আমি প্রস্তাব রাখলাম, আমি বরং অন্য একদিন আসব। সেদিন বলবেন।

তা কখনও হয়। মিঃ মুস্তাফী নিজেকে সামলে নিয়ে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেল। ড্রয়ার থেকে ফাইল বের করে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নিন আমার দেড় লাখ টাকার বিজ্ঞাপনের কনট্রাক্ট। যোগাযোগ রাখলে ভবিষ্যতে আরও পাবেন।

সো কাইন্ড অব ইউ।

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়াতে মিঃ মুস্তাফী বলল, যদি বেশি ব্যস্ততা না থাকে তো আর দু চার মিনিট বসবেন। আপনার মান্থলি ইনকামে হয়তো আরও কিছু সাহায্য করতে পারি।

আমি বসলাম। কেননা, যত ব্যস্ততাতো রোজগারের জন্যই।

মিঃ মুস্তাফী ঘুরণ চেয়ারে দোল খেয়ে বলল, অভিনয় করেছেন কোনোদিন?

আজ্ঞে না।

জীবনটাই তো মঞ্চ আর অভিনয়ের। আর আপনি বলছেন, অভিনয় করেননি? মিঃ মুস্তাফীর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে সরল হাসি।

তেমন অভিনয় তো প্রতিটি মানুষই করে থাকে। আপনিও অবশ্যই।

প্রয়োজন হলে তবেই। এবারকার প্রয়োজনটা খুউব বেশি। আপনি রাজি হলে দুজনের অভিনয়টা হবে ভেরি ইন্টারেস্টিং এন্ড থ্রিলিং। এই অভিনয়ের জন্য আপনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। আমি দেব। আপনার বাড়তি ইনকাম হবে। রাজি?

তার আগে জানা দরকার কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

আমার বান্ধবী আর স্ত্রীর ভূমিকায়। যখন যেখানে যেমনটি দরকার হবে। যেমন ধরুন, স্ত্রীর জেলাস সৃষ্টি করতে আপনি হবেন আমার বান্ধবী। আবার যারা আমার স্ত্রীকে আজপর্যন্ত চোখে দেখেনি তাদের কাছে আপনার পরিচয় হবে স্ত্রী। এক নায়িকার ডবল রোল। পারবেন? দু চারদিন ভেবে না হয় জানাবেন।

বেশ তাই জানাব।

মিঃ মুস্তাফী উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। করমর্দন করে বলল, সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে নিশ্চিত আপনাকে ভাবাবে যে, এই কাজে চেস্টিটি কতটা নিরাপদ? এ বিষয়ে

আমি হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমি অপরিমিত মদ্যপায়ী হলেও নারী-আসক্তি নেই। তাই বলে আপনাকে কোনোদিন মদ্যপান করতে বলব না বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সুজন, সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে এ্যাডভেঞ্চারের বিষয় মনে হয়েছিল। মিঃ মুস্তাফী মানুষটাকেও আমার অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। তা ছাড়া ভাবলাম, যদি এই অভিনয়ের ফলে ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে মন্দ কি। আমার চাকরিটাতো ছাড়তে হচ্ছে না। সুতরাং, আর্থিক লাভ তেমন কিছু না হলেও লোকসানের কোনো ভয় থাকছে না। বরং, মিঃ মুস্তাফীর প্রস্তাবে রাজি না হলে ভবিষ্যতে ওদের সংস্থার বড় অংকের বিজ্ঞাপনটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

সাত পাঁচ ভেবে আমি রাজি হয়ে গেলাম। দ্বিতীয় দিনেই। মিঃ মুস্তাফীকে ফোনে জানাতে উনি পার্কস্ট্রিটের বনেদি রেস্তোঁরায় আমন্ত্রণ জানাল।

সুজন, সেই থেকে শুরু। আমার জীবনে স্বপ্নাতীত ভোগের আস্বাদন। না চাইতেই মিলছে দামি পোশাক প্রসাধন অলংকার উপহার। যাচ্ছি বর্ণাঢ্য পার্টি আর পাঁচতারা হোটেলে। চড়ছি চোখ ধাঁধানো গাড়িতে। বেড়াচ্ছি পাহাড় সমুদ্র দ্বীপ অরণ্য আর দিল্লি মুম্বাই চেন্নাই শহরে। গিয়েছি বিদেশ ভ্রমণে। জল স্থল আকাশের সবরকম যানবাহন আমার মুঠিতে। কখনও সখনও মনে হয়েছে, সারা বিশ্বময় আমি।

সুজন, একসময় আমার মনে হল এখন আমার সব আছে। ইচ্ছে হলে বোধহয় আকাশও ছুঁতে পারি।

সম্ভবত এজন্যই দর্পণদা একটা গল্প লিখেছিল এক যৌবনবতী গোলাপরঙা অহংকারী পাখিকে নিয়ে। নাম দিয়েছিল 'গুলাবী'। সেই পাখিটাকে সঙ্গী হলুদ পাখি আকাশের সাতরঙা রামধনু রঙের দেশে পাড়ি দেয়ার স্বপ্ন দেখায়। গোলাপী পাখিটা খুশিতে ডগমগ। আহ্লাদে আটখানা।

হিতাকাঙ্ক্ষী এক নীল পাখি বোঝাতে চেষ্টা করে, বেশি উঁচুতে উড়তে গেলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে।

গোলাপী পাখি জবাবে বলে, ভালো কিছু পেতে হলে, ঝুঁকিতো নিতেই হবে। আমি সীমাবদ্ধ জীবনের নিয়ম-বাঁধন ছিঁড়ে বৈচিত্র্যময় বিশাল জগতকে জানতে চাই। কেউ আমার গতি রোধ করতে পারবে না।

নীল পাখি ভাবে, রঙীন স্বপ্ন-মোহ-কল্পনা বিভোরেরা দুর্বার দুঃসাহসী হয়ে থাকে। আপনজনদের ভালোবাসার বন্ধন ছিঁড়তে এতটুকু দ্বিধা করে না। তবু শেষবারের মতো চেষ্টা চালিয়ে প্রস্তাব দেয়, তৃণ পাতা মাটির বন্ধন ছেঁড়া জীবন কখনও সুখ শুভ শান্তির হয় না। তা ছাড়া, সৃষ্টির জন্য চাই স্থিতি। হলুদ পাখিকে নিয়ে না হয় এখানেই ঘর বাঁধলে দুজনে।

গোলাপী এমনতর প্রস্তাবে আমল না দিয়ে আকাশে উড়ে যায়।

সুজন, সেই গল্পে পরে দর্পণদা গোলাপী পাখিকে পথহারা সঙ্গীহারা নিঃসঙ্গ অসহায় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত দেখিয়েছে।

আরও অনেক কিছু।

তারপর নীল পাখিটার সহায়তায় গোলাপী পাখির ভ্রান্তিমোচন। অসীম ছেড়ে পুনরায় বন পাহাড় তৃণমাটি জলাশয়ের জগতে প্রত্যাবর্তন।

আশ্চর্য রকম ভালো লেগেছিল গল্পটা। তবু আমি কিন্তু ফিরলাম না। কেননা, বিবাহিতা মিঃ মুস্তাফী আমার আদৌ হলুদ পাখি নয়। ওকে নিয়ে ঘর বাঁধা অসম্ভব। তা ছাড়া, দর্পণদার তখন সংসারে থেকেও অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো আচরণ। কোরান গীতা বাইবেল ইত্যাদি নানা ধর্মের বই পড়ছে তো পড়ছেই। চুল পোশাক আহারে উদাসীনতার চূড়ান্ত।

দর্পণদার দিকে আমার নজর দেয়ার তেমন সময় সুযোগ ছিল না। কল্পিতা অবশ্য দেখভালের কোনো ত্রুটি রাখত না। কিন্তু কে শোনে কার কথা? গভীর চিন্তাভাবনায় আবিষ্টজনদের পার্থিব সুখ ভোগ রূপ রসের প্রতি আকর্ষণ থাকে না।

সুজন, তুমি হয়তো জাননা যে, দর্পণদা ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বর আর ভাগ্যে বিশ্বাসী। সেজন্য, আশ্চর্যরকম টেনশন-ফ্রী। বলে, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ভাগ্যে যা আছে তা ঘটেছে এবং ঘটবে। সুতরাং, বৃথা চিন্তা ভাবনা কেন? তার চাইতে সদা থাক আনন্দে।

বাবাকে বলতে শুনেছিলাম, ভাগ্যের দোহাই দিয়ে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই ঈশ্বর তোকে সবকিছু পাইয়ে দেবে?

তা কেন? দর্পণদা উত্তরে বলেছিল, ঈশ্বর যা কিছু দেন তা কর্মের মধ্য দিয়েই। নিরন্তর প্রচেষ্টা আর কর্ম চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু, সাফল্য ভাগ্যনির্ভর। সে জন্যই একই শিক্ষাদীক্ষা পরিশ্রম সত্ত্বেও কেউ সফল কেউ ব্যর্থ। ঠিক সময়ে যথোচিত চিকিৎসা পেয়েও কেউ মরে কেউ বেঁচে যায়। অনেকেই বিনা চিকিৎসায় প্রকৃতি নির্ভর নীরোগ। দীন দারিদ্রর সন্তানেরাও কেমন হৃষ্টপুষ্ট বেড়ে ওঠে।

থাক থাক। মা থামিয়ে দেয়, তোর লেকচার শুনতে ভালো লাগে না। বেশ বুঝতে পারছি তোর ওপর ভরসা করে লাভ হবে না। সারাটা জীবন আমাদেরকে যেমনটি কষ্টে আছি তেমনি থেকে মরতে হবে। মৌরও কোনো ভালো পাত্রে বিয়ে দেয়া যাবে না।

ভুল ধারণা তোমার। দর্পণদা মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'যে মানুষ দারিদ্র্য সত্ত্বেও অনুদ্বিগ্ন, অভিযোগবিহীন, তিনিই প্রকৃত ঐশ্বর্যবান'—কথাটা আমার নয়। একজন বিখ্যাত ব্যক্তির। আমার মতে, কষ্ট বিনিময়ে প্রাপ্তি সুখকর ও মাধুর্যময়। যেমন ফল ফসল অর্থ গাড়ি বাড়ি ইত্যাদি। আমি আর মৌ যদি তোমাকে কষ্ট না দিয়ে জন্মাতাম তাহলে এত আনন্দ সুখ তুমি পেতে কী?

জানি না, মা একগাল হেসে বলেছিল, এবার ক্ষান্ত দে। কথায় পারব না তোর সাথে।

সুজন, আমার দর্পণদাকে তুমি ঠিকঠাক চিনতে পারনি। যে মানুষটা হঠাৎ হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠে 'আপনারে আপনি চিনিনে....।' তাকে তুমি চিনবে কেমন করে।

দর্পণদা গান খুউব ভালোবাসে। বিশেষ করে লোকগীতি রামপ্রসাদী আর লালন ফকিরের গান। ভক্তিগীতি ব্রাহ্মসঙ্গীত আর রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্বের গানও প্রিয়। ভালোবাসে পল্লীগীতি আর নজরুল সঙ্গীত। বেশি রাত্রে ক্যাসেটে শোনে চৌরাসিয়া আর পান্নালাল ঘোষের বাঁশি। খুউব নীচু স্বরে গুণ গুণ করে 'নিরানন্দ করো না মা।' অথবা 'তোমার মতো দয়াল বন্ধু আর পাব না।' সব চাইতে বেশি যে দুটি গানের কলি ওর মুখে শোনা যায় তা হল 'ওরা চাহিতে পারে না দয়াময়' আর 'আমায় অভাবে রেখেছ সদা হরি হে। পাছে অলস অবশ হয়ে যাই।'

ঈর্ষা ব্যাপারটা দর্পণদার একদম নেই। অল্পেতেই তৃপ্ত সন্তুষ্ট বলে, 'আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম দাওনি'।

এই অল্পে সন্তুষ্টিতে অবাক হয়ে আমি জিগ্যেস করেছিলাম, কোন মন্ত্র বলে এমনটি সম্ভব?

কোনো যপতপ মন্ত্র লাগে না। দর্পণদা বোঝাল, মানুষ সবসময় ওপরের দিকে তাকায় বলেই দুঃখ পায়। ভাবে, আমি কত কষ্টে আছি। এই কষ্টটা আসে অনেক কিছু না পাওয়ার অভাব বোধ থেকে। কিন্তু, আমি তাকাই নিচের দিকে। ভাবি, ওদের যেসব অভাব আছে তা আমার নেই। আমি অধিক সংখ্যক মানুষের চাইতে অনেক ভালো আছি।

সুজন, এমনই অসাধারণ যে মানুষটা তাকে তুমি উচ্চ বৃত্তি বৃত্তে চলে গিয়ে বন্ধুত্ব এড়িয়ে গেলেও সে কিন্তু ক্ষুব্ধ নয়। ঈর্ষা করেনি। খাটো করে দেখার প্রশ্নই আসে না। বরং সবসময় তোমার মঙ্গল কামনা করে।

অনুগত একবার বলেছিল, জানিস দর্পণ তুই কিন্তু সুজনের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী লেখক। সেটা সুজন বোঝে। আর সে জন্যই তোকে ভয় পায়। ইচ্ছে করে এড়িয়ে যায়। ও চায়না তুই সুযোগ পেয়ে প্রতিষ্ঠিত লেখক হয়ে নাম যশের অধিকারী হতে পারিস।

ধ্যেৎ। দর্পণদা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, প্রতিষ্ঠিত লেখক হতে গেলে নিষ্ঠা চাই। লেখাপড়ায় অনেক সময় দিতে হয়। আমার মতো ফাঁকি দিয়ে হয় না। একটা গান আছে, 'আমি সকল কাজের পাই হে সময়....' শুধু লেখালেখির সময়টুকুই পাই না। এটা ফাঁকি ছাড়া আর কিছু না। অন্তত মা সরস্বতীর আরাধনা বলা যায় না।

সে না হয় বুঝলাম। অনুগত যুক্তি জুড়ল, যেটুকু লিখছো সেগুলিও যদি ছাপানোর সুযোগ না পাও তাহলে লেখার উৎসাহ আগ্রহ তাগিদটা আসবে কোত্থেকে?

সৃষ্টির তাগিদটা আসে স্রষ্টার মনের তাগিদ থেকে। তুই তাগিদ আর তাগাদা গুলিয়ে ফেলছিস। তাগাদায় হয়তো অনেক অনেক লেখা হয়। কিন্তু সার্থক রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি হয় না। আমাকে অমনটি হতে বলিস না।

সে নাহয় মেনে নিলাম। কিন্তু সেবার, শারদীয় 'জনবাণী' পত্রিকার কথা মনে আছে। আগে তো তোর লেখা চায়নি। শেষ সময় সর্বার্থ বসু অসুস্থ হয়ে যখন লেখা দিতে পারবেন না জানালেন তখন ওদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তে কি হয়েছিল জানিস?

নাতো। ওরা একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল আমার কাছে। উপন্যাস দিতে পারব কিনা জানতে চেয়েছিল। প্রথম পাওয়া সুযোগ হাতছাড়া করিনি। অসমাপ্ত উপন্যাসটা শেষ করতে রাতের পর রাত জেগেও হয়নি। বিনা বেতনে ছুটিও নিয়েছিলাম ক'দিন। শেষ পর্যন্ত ওদের সমস্যা সমাধান করতে পারায় পরিশ্রম সার্থক মনে হয়েছিল। ব্যস্।

তোর লেখাটা আমরা সবাই পড়েছি। সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছে, ওই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ লেখা ছিল তোরটা।

হবে হয়তো। লিখে আমি বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

কিন্তু, ওরা তোকে কত টাকা দক্ষিণা বা পারিশ্রমিক দিয়েছিল? মাত্র পাঁচশ। সর্বার্থ বসুকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। শুধু কি তাই? ওই সংখ্যাতেই সুজন মাত্র তিন পাতার গল্প লিখে পেয়েছিল দেড় হাজার টাকা।

নামীদের বেলায় টাকার অঙ্কটাতো বেশি হয়েই থাকে।

তাই বলে একখানা উপন্যাসের জন্য মাত্র পাঁচশ! তাতেও বুঝতাম, যদি পরের বছর আবার তোর লেখা চাইত।

তুই যেমনটি বলছিস, আমার উপন্যাসটা যদি সত্যিই তেমন ভালো লাগত তাহলে হয়তো চাইত। ওদের হয়তো তোদের মতো তেমন উৎকৃষ্ট মনে হয়নি।

ওদের দপ্তরের অনেকের সঙ্গেই আমার কথা হয়েছে। সবাই আমার সঙ্গে একমত। ওদের কাছ থেকেই জেনেছি যে, তোর লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে দপ্তরে বেশ কয়েকটি চিঠিও এসেছিল। তবু তোর লেখা না চাওয়ার কারণটা কি জানিস?

কি কারণ থাকতে পারে?

কলকাঠি নেড়েছে সম্পাদকের এক গেলাসের বন্ধু সুজন।

কি বলছিস তুই?

ঠিকই বলছি। এ যুগে উত্তরসুরী সূত্রে রাজনৈতিক নেতা সিনেমার নায়ক নায়িকা লেখক লেখিকার বংশ থেকে নেতা নায়ক নায়িকা লেখক লেখিকা হয়। কিন্তু বন্ধুসুবাদে দর্পণ লেখক হওয়ার সুযোগ হারায়।

থাক ওসব কথা।

দর্পণদা সেদিন মনকে মলিন হতে দিতে চায়নি। তাই তো বলছি, তুমি বন্ধু চিনলে না।

সুজন, সেদিন 'মুখর মেলা'য় তোমার মতো অনেকের বক্তব্যেই মূল্যবোধ মানবিকতা পরিপূর্ণ নারীর মর্যাদা অধিকার ইত্যাদি প্রসঙ্গত ব্যবহৃত হচ্ছিল। সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষাকারিণীদের প্রতি যথেষ্ট সহৃদয় বিনম্র সহানুভূতিশীল তা বোঝানোর উদ্দেশ্যে। উথলে ওঠা দরদ-দুধে কতটা জলের মিশ্রণ ছিল তা বিচার করবে কে?

বক্তাদের গৃহে অর্ধাঙ্গিণী পরিচয়ে যে বা যারা সংসারের হাজারো ঝক্কি ঝামেলা সামলায় এবং পতির স্বাস্থ্যও রক্ষা করে বিনিময়ে কোনো শ্রেণির মর্যাদা পেয়ে থাকে?

সুজন, সেদিন তোমরা ছিলে বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমন্ত্রিত অতিথি। তোমার নিশ্চিত জানা আছে যে, ষাটের দশকে আমেরিকায় 'ফেমিনিস্ট' পরিচয়ে নারী বিদ্রোহ হয়েছিল। বিদ্রোহের মূলে ছিল, সামাজিক বঞ্চনা গৃহদাসিত্ব অধিকারহীনতা এবং বিবাহসূত্রে আইনসম্মত ধর্ষণ। ওরা মনে করেছিল, পুরুষের সাহায্য-বর্জিত আন্দোলন মাধ্যমেই নারীমুক্তি সম্ভব। সত্তরের দশকের এই আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বলেছিল, 'আজ কি নারী সীতা নেহি, দ্রৌপদী হ্যায়।'

সুজন, তোমরা এই দাবি মেনে নিতে পারবে? মহাভারতের ভীষ্ম পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমরা নারীকে সম্মান দিতে ভয় পাও। মেজাজ দেখিয়ে দাবিয়ে রাখতে চাও।

ঠিক তাই। তা না হলে তোমার স্ত্রী সেবন্তীর সঙ্গে বনিবনা হল না কেন। মাত্র তিন বছর বয়সের পুত্র অবনকে নিয়ে সেবন্তী সেই যে পিত্রালয়ে গেল, আর ফিরল না। অবনকে দখলে রাখতে কম চেষ্টা চালাওনি তুমি। নাবালক বলে সফল হওনি।

সেবন্তী কিন্তু আইনের আশ্রয় নেয়নি। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পুনরায় সংসার পাতায়নি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে। আসলে ওই 'ফেমিনিস্ট'দের মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল সেবন্তী। কেবলমাত্র সাংসারিক দাসীবৃত্তি ওর পছন্দ ছিল না। নারী কল্যাণ সমিতি গড়ে তুলেছিল। সমাজ সেবায় বিস্তর সময় দিচ্ছিল। তাতেই তোমার আপত্তি। গলদঘর্ম বাড়ি ফেরার পর সেবন্তী যখন ক্লান্ত অবসন্ন সেই সময় তোমার পুরুষের অধিকারবোধ প্রভুত্ব বাসনা জেগে উঠত। শুরু হতো বিরাম বিহীন তিরস্কার ভর্ৎসনা আর মানসিক নির্যাতন।

সুজন, সেদিনের মেলার মঞ্চে প্রগতিশীল অত্যাধুনিক বক্তা তুমি কিন্তু অন্তরে মনু মতাবলম্বী। তোমার বিশ্বাস, 'প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।' অর্থাৎ কিনা প্রজননের জন্য সৃষ্ট নারীরা হবে পূজনীয়া গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। কিন্তু, সেবন্তী মানবে কেন? তোমার মতো তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নাহলেও শিক্ষিতা মেয়ে। তদুপরি

পুস্তক প্রকাশনা সংস্থার মালিকের কন্যা। বার্নাড শ'র কিছু বইও পড়েছে। তাই মগজে ছিল সেই উক্তি 'স্ত্রীত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তবেই পৌরুষেয়তার বিরুদ্ধে যথার্থ লড়াই করে জয়ী হওয়া যায়।'

সেবন্তী তোমাকে যথেষ্ট মেনে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল। তোমার লেখা-লেখিতে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে নজর রেখে সন্তান প্রতিপালন ঘরগৃহস্থালী অতিথি আপ্যায়ণ লোক লৌকিকতার দায়িত্ব একাই পালন করত। তোমার মদ্যপান, অধিক রাত্রে বাড়ি ফেরা স্ত্রীপুত্র ছাড়া শৈলসমুদ্র অরণ্য পরিবেশে অথবা বিদেশে বেড়াতে যাওয়া উদার মনে মেনেই নিয়েছিল। দুর্জনেরা বোঝাতে চেষ্টা করত, সরল বিশ্বাসে সুজনকে এভাবে একা যেতে দেয়া ঠিক হচ্ছে না। পুরুষ মানুষকে এতটা ছেড়ে দিতে নেই। পরে পস্তাতে হতে পারে।

সুজন, প্রত্যুত্তরে সেবন্তী কি বলত জান? বলত, না ছাড়লে লিখবে কেমন করে। চারদেয়ালে আবদ্ধ থেকে ভালো লেখক হওয়া যায় না। তা ছাড়া অবিশ্বাস করে জেতার চাইতে বিশ্বাস করে ঠকাও ভালো। অবিশ্বাসে শুধুই কষ্ট বাড়ে। শান্তি বিঘ্ন হয়। ঘরের বাইরে বিশাল জগত। সেই জগতে কে কি করছে তার ওপর নজরদারীর প্রচেষ্টা মূর্খামি। তার চাইতে বিশ্বাসের শান্তি শ্রেয়।

শান্তিপ্রিয়া সেবন্তীর নির্ভেজাল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তুমি হয়ে গেলে পূর্বসূরী ইজরায়েলের ডেভিড, জুড়িয়ার হেরোড, গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেন, পণ্ডিত জীমূতবাহন, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যারিস্টার উইলিয়ম হিকি আর কতিপয় মোগল সম্রাটদের মতো প্রবল অমিতচারী একজন।

সুজন, ভাগবতে পড়েছিলাম 'দেহাদিতে আসক্ত বিশিষ্ট বাসনাবদ্ধচিত্ত ব্যক্তি নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।' তুমিও বোধহয় কম বেশি নিজেকে তেমনটি মনে কর। ওই ভাগবতেই আছে, 'বিবাহিতা কামিনীর মন অন্য পুরুষে গেলে তার নূতনতরের প্রতি দুর্বার আসক্তি হয়ে থাকে।' তেমনি এক রমণীর নাম সিঞ্চিতা।

মদালসা নিবিড় নিতম্বিনী আঁটসাঁট শরীরের সিঞ্চিতা দেহসর্বস্ব নারী। ওর ধারণা, 'কামান্ধ পুরুষকে তৃপ্তিদানের মতো কিছুই নেই পৃথিবীতে।' কামান্ধ পুরুষদের মধ্যে তুমি অন্যতম একজন। তোমার মতে, 'রমণের জন্যই রমণী।' অথচ, তুমি নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্পর্কে পড়াশুনো করেছো। ওঁরা নটী আর পতিতাসহ সমগ্র নারী জাতিকে কোন দৃষ্টিতে আদৃত করেছিলেন তা ভাব না একবারও। মনে কর না যে ওদের মধ্যেও ঈশ্বরের বসবাস আছে।

সুজন, তুমি হয়তো জান না যে, সেবন্তী বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে উদ্ভ্রান্ত অস্থির মানসিকতায় দর্পণদার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে আসত। তোমার নির্মম অমানবিকতা প্রবল অমিতাচার আর পাশবিকতা সম্পর্কে অনেক কথা বলত। সেবন্তী অথবা অবন রোগশয্যায় যন্ত্রণায় ছটফটালেও মাতাল তুমি নাসিকা গর্জনে

নিশ্চিন্তে ঘুমোতে। সেবন্তী অনুযোগ অভিযোগ জানালে বলতে, নিশ্চিন্ত ঘুম হল ঈশ্বরের দান। তিনি দান করলে আমার কি আর করার থাকে। সেবন্তী একদিন আমাকে শুনিয়েছিল, মেয়েদের বিশেষ কষ্টদায়ক দিনগুলিতেও তুমি নাকি ছাড় দিতে চাও না। ধর্ষণ বলাৎকার আর কাকে বলে? ভাগ্যিস সেবন্তী পেনাল কোডের আশ্রয় নেয়নি। ভারতের প্রধান বিচারপতি বলেছেন পতিতাদেরও 'না' বলার অধিকার আছে। সেবন্তী তো হিন্দু মতে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী।

সুজন, নারীকল্যাণ সমিতির আলোচনা সভায় একদিন গিয়েছিলাম। সেবন্তী সেখানে বলেছিল, উন্নত দেশ বলে পরিচিত আমেরিকাতেও নাকি মেয়েরা শোষিতা। অনেক আমেরিকান পুরুষ স্ত্রীকে প্রহার করে আনন্দ পেয়ে থাকে। জাপানে স্ত্রীদের প্রহার করা জলভাত ব্যাপার। চীন দেশে সন্তান আনা না আনা নিয়ে স্ত্রীদের ওপর নির্যাতন চলে। আর পাকিস্তানে ধর্ষিতা মেয়েদেরকে অভিযুক্ত করে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। আমাদের দেশের ঘটনা তো চোখে দেখছেন। খবরের কাগজে পড়ছেন।

সেবন্তী সেদিন নিজের ঘরের কথা বলেনি। তুমিও বল না। কোনো একটি পত্রিকায় তোমার লেখা পড়েছিলাম। গল্প উপন্যাস নয়। অধুনা প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সম্পর্কে লেখা। নারী সম্পর্কে অনেকের ভিন্নতর দুর্বলতার বিশ্লেষণের লেখাটির নাম দিয়েছিলে 'বলতে দ্বিধা লাগে।'

নমস্য শ্রদ্ধেয় প্রিয় অনেকের সম্পর্কে অজানা তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যটা সঠিক বুঝলাম না। লেখাটা নির্ভীক সৎসাহসিকতার পরিচয় হতো যদি নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে খোলামেলা লিখতে। নিজের সম্পর্কে একটি লাইনও কিন্তু লিখলে না। আসলে সেদিন 'মুখর মেলার' মঞ্চ থেকে ওদের বৃত্তিটাকে যতই নৈতিক পরিষেবা বলো না কেন অন্তরে চাও গোপনীয়তা। কেননা, গোপনীয়তাতেই যত সৌন্দর্য মাধুর্য। যদি সত্যিই তোমাদের যুক্তিতে ওরা 'ব্রাত্য' না হয়ে 'সম্মানীয়া' তাহলে প্রকাশ্যে মেলামেশায় ভয় পাওয়ার কথা নয়। অথচ, সেই ভয়ই তুমি গ্যাংটকে পেয়েছিলে।

ঘটনাচক্রে একই হোটেলে উঠেছিলাম আমরা দুজনে। আমার সঙ্গী ছিলেন যথারীতি মিঃ মুস্তাফী। বুকিং কাউন্টারের খাতায় আমার পরিচয় লেখা ছিল, বান্ধবী। আর তুমি স্ত্রী সেবন্তী পরিচয়ে যে মহিলাকে নিয়ে গিয়েছিলে সে ছিল নকল। হোটেলের ম্যানেজার তোমার পরিচয় জেনে অভিভূত। খাতির যত্নআত্তি করছিল মাত্রাতিরিক্ত।

আমি তখনও জানতাম না, বত্রিশ নম্বর রুমে কোনো ভি আই পি-র জন্য ম্যানেজারের এত উৎসাহ উচ্ছ্বাস তৎপরতা। একই সঙ্গে সাময়িক লোডসেডিং আর জেনারেটর বিকল সময়ে সবার আগে বালতি বালতি স্নানের জল পৌঁছে যাচ্ছে বত্রিশ নম্বরে। অন্যদের বেলায় বলা হচ্ছে, একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। মিস্ত্রী মেশিনে হাত লাগিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনারেটর চালু হয়ে যাবে।

কিন্তু বত্রিশ নম্বরের বেলায় আপনি অন্য ব্যবস্থা করছেন কেন? ক্ষোভ বিরক্তিতে ম্যানেজারকে জিগ্যেস করলাম, কোন মহারাজ আছেন ওখানে?

মহারাজের চাইতেও দামী মানুষ আছেন। ম্যানেজার খুশি ঝলমল মুখে জানালেন, একালের বিখ্যাত লেখক সুজন চৌধুরী সস্ত্রীক উঠেছেন আমাদের হোটেলে নামটা আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন?

ওর নাম কে না জানে। সেবন্তী তোমার সঙ্গে গ্যাংটকে বেড়াতে এসেছে শুনে আমার বিশ্বাস হল না। কেননা, ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে পৌঁচেছে তা আমার অজানা ছিল না।

ওর লেখা 'নারীমন' মেগা সিরিয়ালটাতো দারুণ জমে উঠেছে। উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে ম্যানেজার জিগ্যেস করল, আপনিও নিশ্চয়ই দেখছেন?

হ্যাঁ, দেখছি। অন্যমনস্ক জবাব দিলাম। আমি তখন অন্য ভাবনায় মগ্ন ছিলাম। ভাবছিলাম, তোমাদের সন্তান অবনও যে সঙ্গে এসেছে তাতো বলল না। নিশ্চিত কোনো রহস্য আছে।

দেখবেনই তো। ম্যানেজার উচ্ছ্বসিত খুশিতে ফের বলল, এখন যতগুলি সিরিয়াল চলছে তার মধ্যে 'নারীমন' এর দর্শক সবচাইতে বেশি।

কেমন করে বুঝলেন?

এ্যাড দেখে। বিজ্ঞাপনদাতারা তো দর্শকের সংখ্যা বুঝেই বিজ্ঞাপন দেয়। দিন দিন এত বিজ্ঞাপন বাড়ছে সিরিয়ালের অল্প অংশ কমছে। মন ভরছে না।

ঠিক তাই। ম্যানেজারের বাচালতা বন্ধ করতে আমি অন্য প্রসঙ্গে গেলাম, যতদূর মনে পড়ছে সুজনবাবুর স্ত্রীর নামতো সেবন্তী। তাই না?

দাঁড়ান দেখছি। রেজিস্ট্রি খাতা টেনে নিয়ে বলল, ওর নাম কি আর মনে রেখেছি? চেহারা অবশ্য চোখের সামনে ভাসছে। দেখতে যেন ডানা কাটা পরী।

তাই বুঝি?

এইতো পেয়েছি। রেজিস্ট্রি খাতার পাতা মেলে ম্যানেজার বলল, ঠিক বলেছেন আপনি। চেনেন নাকি?

দুজনকেই চিনি।

আপনাকে ওরা চেনেন?

চিনতো। এখন চিনবে কিনা জানি না।

তাহলে আমি বরং আপনার নামটা বলে দেখব। চিনলে ভালোই হবে। একসঙ্গে ঘুরতে ফিরতে সাইট সিয়িং এ যেতে পারবেন। সময়টা কাটবে ভালো।

সুজন, আমি কার সঙ্গে কি পরিচয়ে গ্যাংটক ভ্রমণে এসেছি হোটেলের ম্যানেজার নিশ্চিত তোমাকে বলবে জানতাম। তবু আমার বিন্দুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ হয়নি। কিন্তু একই হোটেলে আমার উপস্থিতি জানতে পেরে নির্ঘাৎ

তুমি আতঙ্কিত হয়েছিলে। সে জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছিলে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কত জনের সঙ্গেই তো ক্ষণিকের আলাপ পরিচয় হয়। সবার নাম মনে রাখা সম্ভব নয়।

মৌমিতা নিশ্চয়ই সেই শ্রেণির একজন নয় যে নামটা মনে পড়েনি। মন চাইলেও অপরাধী কখনও স্বীয় অপরাধ ভুলে থাকতে পারে না। সেজন্য সর্বদা সতর্ক থেকে অপরাধকে আড়ালে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। আজীবন।

সেই সতর্কতাতেই তুমি নকল সেবন্তীকে আড়ালে রেখেছিলে। সমস্ত দিন রাত। বত্রিশ নম্বর ঘরের বাইরে পা ফেলতে দাওনি। দুজনে খাবার খেয়েছো রুম সার্ভিসে।

বিকেলে তুমি একা বেরুচ্ছিলে। ম্যানেজার জিগ্যেস করল, কোথায় চললেন স্যার?

তুমি বললে, এই একটু ঘুরতে ফিরতে। ভাবছি, সামনের মার্কেটটাও একবার ঘুরে দেখে আসব। যদি স্থানীয় কুটীর শিল্পের তেমন কিছু নজরে পড়ে।

একা শপিং-এ! ম্যানেজার জিগ্যেস করল, মিসেস যাবে না?

যেতে চেয়েছিল, আমিই বারণ করলাম। লং জার্নিতে ভয়ানক টায়ার্ড হয়ে পড়েছে। বোঝালাম, তিন দিনের বুকিং তো আছে। পেলিং যাওয়ার আগে শপিংয়ের অনেক সময় পাবে। তা ছাড়া, কাল ছাঙ্গু লেকে যাওয়ার আছে। আজ বরং ফুল রেস্ট নাও।

ঠিক বলেছেন। ম্যানেজার তোমার বানানো গল্পে বিশ্বাস করে বলল, ছাঙ্গু যাতায়াতে দারুণ ধকল সইতে হবে। রাস্তাটা একটু টাফ্।

গাড়ি বুক করা হয়ে গেছে? তুমি জানতে চাইলে।

ইয়েস স্যার। ম্যানেজার গদগদ গাড়ির নাম শোনাল, টাটা সুমো। একই গাড়িতে মিঃ মুস্তাফীরা দুজনেও যাবেন। সকাল পাঁচটায় রেডি থাকবেন।

সুজন, আমরাও যাব শুনে তোমার নিশ্চয়ই ভুরু কুঞ্চিত হয়েছিল। ললাটে একাধিক রেখা প্রকট হয়ে উঠেছিল। তোমার মুখখানা আমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল। আমি শুধু তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। রিসেপশন কাউন্টারের ঠিক পিছনের রুমে থাকা সুবাদে।

তুমি কিন্তু সেদিন আদৌ মার্কেটে যাওনি। অনুমান, অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অনেক দূরে কোথাও গিয়েছিলে। ফিরে এসে গল্প ফেঁদে বললে, মার্কেটে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এখানকার ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ওর কোয়ার্টার থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সুন্দর নজরে পড়ে। ভীড়ভাট্টা নেই বললেই চলে। দারুণ রোমান্টিক পরিবেশ।

অতএব যেহেতু বন্ধুটি তোমাকে হোটেলে থাকতে দিতে নারাজ তাই সেই

রাত্রেই মালপত্র গুটিয়ে চলে গিয়েছিলে। আমরা জানলাম পরের দিন ভোরে যখন ছাঙ্গু লেকে গেলে না।

সুজন, হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে পেলিং-এর কোন হোটেলে তোমাদের বুকিং আছে জেনে নিয়েছিলাম। যদিও আমাদের হোটেল থেকে সেই হোটেলের দূরত্ব কম না, তবু আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। জেনেছিলাম, সেখানেও যাওনি। এত ভীতু তুমি ? আমার ভাবতে অবাক লেগেছিল। হয়তো নামযশ খোয়ানোর আশঙ্কাতেই তোমাকে বিস্তর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে হয়েছিল।

এদিক থেকে তুলনামূলক বিচার করলে, মিঃ মুস্তাফী আর আমি অনেক বেশি স্বাভাবিক খোলামেলা স্বাধীনতাভোগী। মিঃ মুস্তাফীকে তোমার মতো গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে থাকা দরকার হয় না। সবসময় খুশি ঝলমল চনমনে এই মানুষটাকে আমার বেশ ভালো লাগে।

মিঃ মুস্তাফী বণিকসভার দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকলেও ওর মনটা সংস্কৃতিমুখী। সাহিত্য নাটক সঙ্গীত ভালোবাসে। ওই জগতের মানুষজনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করতে ওর বিশেষ আগ্রহ উৎসাহ। কিন্তু মদ্যপানে ওর সবচাইতে বেশি আসক্তি, আনন্দ তৃপ্তি। সুরাপান ক্ষেত্রে সম্প্রদায় শ্রেণি আর ভিন্নতর বৃত্তিবলয়ের ব্যক্তিরা ভেদাভেদহীন। সেই সুবাদে মিঃ মুস্তাফীর সৌখিন আবাসে মাগনা মদ খেতে যায় অনেকে। অত্যাধুনিক সিঞ্চিতাও সেই আসরে মাঝে মধ্যে সঙ্গ দিত। অল্প স্বল্প পান করত। কিন্তু বেশি ঢালত মিঃ মুস্তফীর গেলাসে। বিশেষ করে সেদিনটাতে যেদিন মিঃ মুস্তাফীর আসরে সঙ্গী থাকত মাত্র একজন। মিঃ মুস্তাফী গভীর ঘুমে ঢলে পড়লে শুরু হতো সিঞ্চিতার ছলাকলা খুনসুটি। দেহজ কামনা বাসনা চরিতার্থ করত অতি সহজে।

সুজন, তোমার সঙ্গে সিঞ্চিতার বইমেলায় পরিচয়। সিঞ্চিতা মুখ্যত সিনেমা অবসীন পর্ণ পত্রিকা কামগন্ধযুক্ত বই পড়তে ভালোবাসে। শারদীয়া 'বিরল' পত্রিকায় 'খায় ভাল' তোমার উপন্যাস বেরিয়েছিল। সেটি পুস্তকাকারে বইমেলায় প্রথম প্রকাশের দিন ছিল। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনে মনে হয়েছিল, জন্ম নয় যেন আবির্ভাব। বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিটি বিক্রিত বই-এ স্বাক্ষর দিচ্ছিলে।

সিঞ্চিতা তোমার বই কিনেছিল ভিড় কমে যেতে। তখন আলাপ পরিচয়ে জহুরী জহর চিনেছিল। প্রথমে ফোনাফুনি। ঘন ঘন তোমার পত্রিকা অফিসে সাক্ষাৎ। তারপর শহর থেকে দূরে হলিডে রিসোর্ট-এ দিবাবাস।

সিঞ্চিতা বিয়ের পর প্রথম দিকে গর্ভে সন্তান ধারণ করে শরীরের সৌন্দর্য খোয়াতে চায়নি। নিজের দেহ সৌন্দর্য সম্পর্কে এত বেশি গর্বিতা ছিল যে মিঃ মুস্তাফীকে পাশে বেমানান মনে করত। তাই কোনো অনুষ্ঠানে স্বামীর সঙ্গিনী হতো না। যুগলে যেতে না চাওয়ার এই গূঢ় কারণটা মিঃ মুস্তাফী বুঝত না। তাই অভিমান হতো নিঃসঙ্গবোধে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করত। ফলশ্রুতি সিঞ্চিতা এক সময় টের পেল,

মিঃ মুস্তাফী ওর পুরুষোচিত সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সে কারণে ডিভোর্সী হতে পেরেছে অতি সহজেই। তুমিও সহজেই ওকে শ্রীরামপুরে 'গঙ্গামুখি' ওনারশিপ ফ্লাটে ব্যক্তিগত করে রাখতে পেরেছো।

সুজন, আমি কিন্তু মিঃ মুস্তাফীর ব্যক্তিগত নয়। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অসাধারণ ব্যতিক্রম। আমি অলংকার বিশেষ বান্ধবী। দুজনের দৈহিক সম্পর্ক অসম্ভব অবাস্তব। আমরা স্বামী স্ত্রী নই। লিভ টুগেদারও করি না। পৃথক আবাসে বসবাস। কিন্তু প্রয়োজনে এক শয্যায় রাত কাটাই।

মিঃ মুস্তাফী শ্রমে ক্লান্তি মানসিক অশান্তি অথবা বিষণ্ণ নিঃসঙ্গবোধে আমাকে ডাকে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যাবতীয় জরুরি কাজ ফেলে ওর কাছে ছুটে যাই। সাধ্য মতো সঙ্গ দেই। প্রেরণা জোগাই। অবসাদ বিলোপে সাহায্য করি। শান্তি ফেরাতে সচেষ্ট থাকি। নানাভাবে ওকে আনন্দিত চনমনে চাঙ্গা করে তুলি। বেঁচে থাকতে শেখাই।

আমাকে তুমি বিনোদিনী আনন্দদায়িনী নিষ্কাম-সঙ্গিনী অথবা সেবিকা বলতে পার। যৌনকর্মী বলতে পার না। সেদিন 'মুখর মেলা'য় যাদের হয়ে বক্তব্য রেখেছিলে এই দেশে এখন ওদের সংখ্যা কত জান? বিশ লক্ষাধিক। সিকিভাগ শিশু ও বালিকা। এ ছাড়া, হিসাব বহির্ভূত সংখ্যাটা নেহাত কম হবে না।

প্রশ্ন হল, 'কর্মি' শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি শ্রমিক আন্দোলন গোছের কিছু করা? অথবা অসংগঠিত শ্রমিকদের মতো বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেয়া। গুণীজন তোমরা কি ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধি হওয়ার ইচ্ছা রাখ?

সুজন, তোমার কলমেই তো যথেষ্ট শক্তি। তবু কেন কোনো গল্প উপন্যাসে ওদেরকে বজ্রকঠিন দৃঢ় দীপ্তিময় কল্যাণময়ী দেবি বা মানবীরূপে চিত্রিত কর না। কেন অসতী দুশ্চরিত্রা পতিতা বেশ্যা ইত্যাদি অপমানকর শব্দে ঘৃণা ছড়াও। 'নিষিদ্ধ পল্লী' শব্দটাও এড়াতে পার না। কলম-শক্তিতে ওদেরকে সসম্মানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছো কখনও? অথচ, ওরা কিন্তু স্বইচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে আনন্দদায়িনী। সমাজের পবিত্রতা রক্ষকারিনী। সমাজ উন্নয়নে দাত্রী। স্বাধীনতা আন্দোলন সংগ্রাম বিপ্লবে সাহায্যকারিনী। ওরা মানুষের ঘৃণা উপেক্ষা করে সংসার ধর্ম করে। সন্তান প্রতিপালন করে। মানুষকে হতাশা মুক্ত করে। সর্বোপরি ওরাও ঈশ্বরপুত্রী।

সুজন, মাসে অন্তত একবার দর্পণদা কালিঘাটে পুজো দিতে যাবেই। অভ্যাসটা অনেক পুরনো। আগেই বলেছি দর্পণদা কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। কিছুদিন যাবতই বলছিল, একজোড়া খড়ম কিনতে হবে।

দর্পণদা একদিন কালী মন্দিরে পূজা সেরে খড়ম কিনতে গিয়েছিল। কোনো দোকানেই সঠিক মাপের খুঁজে পাচ্ছিল না। একটা দোকানে নিরাশ হতাশ হয়ে বলল, আমার পা দু'খানা কী এতটাই বেখাপ্পা যে কোনো দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না!

অষ্টাদশ বর্ষীয় রোগা বিক্রেতা যুবকটি অনেক খুঁজে পাওয়া অপেক্ষাকৃত আরও বড় একজোড়া খড়ম ধুলো ঝেড়ে এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা দেখুন তো।

হবে না। দর্পণদা স্পর্শ না করে দেখেই বলল, খামোকা তুমি কষ্ট করলে।

হন্যে হয়ে ঘুরেও না পাওয়ার কষ্টটা আপনারই বেশি। এতক্ষণ নজরে না পড়া পিছন দরজায় দাঁড়ানো পড়ন্ত যৌবনের সুশ্রী একটি মেয়ে বলল। তারপর কাছে এগিয়ে এসে বলল, ক্রিয়া কর্ম প্রয়োজনে কেনে বলেই একরকম রাখি। আজকাল কেউ তো নিজে পরবে বলে খড়ম কিনতে আসে না। সবাই হাওয়াই চপ্পল পরে। তাই হাওয়াই একটাই এর বদলে নিত্য নতুন কোম্পানীর হাওয়াই চপ্পল বের হচ্ছে। আপনি হঠাৎ খড়ম পরতে চাইছেন কেন?

খড়ম-পরা পায়ে হাঁটার শব্দটা আমার অদ্ভুত রকমের শ্রুতিমধুর লাগে বলে। দর্পণদা কপট গাম্ভীর্যে বলল, তা ছাড়া বয়স বাড়ছে তো। এখন থেকেই ধাপে ধাপে অন্যমুখী জীবনে যাওয়ার চেষ্টা চালানো দরকার।

বয়স বলায় পুরুষেরা মেয়েদের উল্টোমুখি। মেয়েটি তীর্যক তাকিয়ে বলল, এমন কিছু বয়স তো হয়নি আপনার। শরীর স্বাস্থ্য চুল দেখে তো ইয়াংই লাগছে।

বয়স শুধু বছর গণনায় বাড়ে না। দর্পণদা আলতো হেসে বলল, দুঃখকষ্ট-যন্ত্রণাদগ্ধ তিক্ত অভিজ্ঞতায় অনেকের ভেতরটা আগাম বুড়িয়ে শুকিয়ে যায়। বাইরে থেকে দেখে মালুম হয় না।

বোধহয় তাই। একাত্মবোধে মেয়েটি প্রশ্ন জুড়ল, আপনার অন্যমুখি জীবনে যাওয়া ব্যাপারটা কিরকম?

প্রথমে নিরামিষাশী হব। সবরকম নেশা বর্জন করব। তারপর গেরুয়া পোশাক ধরব। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর চিমটে কমণ্ডলু ইত্যাদি? মেয়েটি ফিচেল হেসে বলল, এখান থেকে কিনবেন কিন্তু।

বললাম তো, ধাপে ধাপে। দর্পণদা সপ্রতিভ বলল—এক্ষুণি অতদূর ভাবছি না। জানেন তো, অনেকে শ্মশানে সংসার পাতে। আবার অনেক মানুষ আছে যারা সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী মনস্ক।

আপনি কোন দলের? মেয়েটির কমলা-কোয়া ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

ইদানিং আধ্যাত্মিক নানা বই পড়ে আমার ধারণা জন্মেছে, ভোগ তৃষ্ণা আকাঙ্খা আর নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সঠিক পথ হল, আত্মসংযম। মনকে ঈশ্বরমুখী কল্যাণমুখী করার জন্য মাঝে মাঝে নির্জন অজ্ঞাতবাস দরকার। বনবাসেই সম্ভব, স্বচ্ছ স্বাচ্ছন্দ্যতা উদারতা শান্তি আর সন্তোষ। বনই অমৃতায়ন।

তাহলে শেষ মেষ বনেতেই যাচ্ছেন? মেয়েটি দুষ্টমিষ্টি হেসে বলল, আপনিতো

দারুণ ইন্টারেস্টিং। তারপর নির্ভেজাল আন্তরিক অনুরোধ জানাল, হাতে সময় থাকলে বসুন না কিছুক্ষণ। আপনার মুখ থেকে আরও কিছু ভালো কথা শুনি।

আপনাকে আমার রহস্যময়ী লাগছে। দর্পণদা সুমুখের বেঞ্চিতে বসে খোলা মনে বলল, বনে যাওয়ার কথা বলছিলেন তো? কিছুদিন আগেই গিয়েছিলাম। এক হরিজন বৃদ্ধের কুটিরে অতিথি হয়েছিলাম। বৃদ্ধটি গাঁয়ে জাতপাত দাঙ্গায় হরিজন নিধনে পরিবারের প্রাণ বাঁচাতে কিভাবে আত্মীয়স্বজন ক্ষেতজমি বাড়ি ছেড়ে শান্তির প্রত্যাশায় বনে এসেছিল সেই বৃত্তান্ত শোনাল। তারপর বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে বলল, এখানেই বা শান্তি সন্তোষ কোথায়? জঙ্গলেও ক্ষুধা লাগে। রুটি কাপড় ওষুধ দরকার হয়। হিংসা লালসা আছে। আগুন লাগে। রক্ত ঝরে। দুটি জোয়ান ছেলে গভীর অরণ্যে কাঠ আর মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ক্ষুধার্ত বাঘের পেটে খাদ্য হয়ে গেছে। বউ মরেছে দাবানলের আগুনে পুড়ে। এক মেয়ে চিকিৎসার অভাবে অসুখে মারা গেছে। অপরটি মরেছে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে।

তাই ভয় পেয়ে পালিয়ে এলেন?

ভাবলাম, বনেও যদি হিংসা লোভ ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক থেকে নিস্তার না থাকে তাহলে সংসারে সন্ন্যাসী-জীবনই ভালো।

তাহলে শান্তি কি কোথাও নেই?

এখন মনে হয়, শান্তি একমাত্র শ্মশানে।

শ্মশান প্রসঙ্গ থাক। মেয়েটি আলোচনার মোড় ঘোরাল, আপনি পুজো দেয়ার পর কিছু খেয়েছেন?

একখানা সন্দেশ-প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভেঙেছি। ভেবেছিলাম, খড়মজোড়া কিনে মোড়ের দোকান থেকে চা জলখাবার খাব।

তার বদলে গরীবের চা রুটি তরকারিই না হয় খেলেন। মেয়েটি সম্মতির অপেক্ষায় থেকে যুবকটিকে বলল, তুই যা। দু'জনের জন্য পাঠাতে বলিস।

ছেলেটি কে? দর্পণদা পরিচয় জানতে চাইল।

আমার ভাই, শুভেচ্ছা। বি ই-র ছাত্র। ওর বড় দুবোন, ঈষা আর পুষ্যা। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে।

আমি সবার বড়।

আপনার নামটা?

শ্রবণা। সবে গ্র্যাজুয়েট হয়েছি এমন সময় হঠাৎ মা মারা গেলেন। ব্যস্, মাতৃরূপে গৃহকর্ম-ব্রতে নিপুণা হতে গিয়ে আর পড়াশুনা হল না।

আমার নাম দর্পণ। আমার বাবাও অসময়ে হঠাৎ মারা যেতে এম এ পরীক্ষা দিতে পারিনি।

এক মিনিট। শ্রবণা শুভেচ্ছার আনা চা জলখাবার এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন খেতে খেতে বলুন শুনি।

তক্ষুনি একটা চাকরি দরকার। পেলাম বটে টিকল না। একমাত্র বোন তখন কলেজে পড়ছে। মাও বেশিদিন বাঁচল না। তারপর—।

বুঝেছি। শ্রবণা থামিয়ে দিয়ে বলল, তারপর যাহোক একটা কাজ জোটালেন এবং পিতৃরূপে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পতি হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

সে জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। আমার বিশ্বাস, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। যা কিছু করেন, সবই ইচ্ছাময়ী শক্তিদায়িনী মা কালী।

মা কালীর ওপর দেখছি আপনার অগাধ বিশ্বাস ভক্তি।

সে জন্যই তো বিপদ আপদ সুখ দুঃখে এখানে ছুটে আসি। এই পথেই তো যাতায়াত করি। আপনাকে কখনও এই দোকানে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

দু'মাস আগেও বাবা বসতেন। শ্রবণার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হল, ক্যান্সার রোগে এখন তিনি মৃত্যুর অপেক্ষায় শয্যায় শুয়ে। বাবা মারা গেলে অসহ্য কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন বুঝি। কিন্তু আমরা যে অভিভাবক-শূন্য হয়ে যাব। মাথার ওপর কেউই থাকবে না ভাবলে ভয়ানক ভয় হয়।

জানি না, মা কালীর ওপর আপনার বিশ্বাস ভক্তি আছে কিনা। থাকলে দেখবেন, তিনিই সব ভয় বিপদ সমস্যা মুক্ত করবেন।

মাকে তো আমিও ডাকি। শ্রবণা বিষাদ বিষণ্ণ বলল, তবু মাঝে মাঝে অবিশ্বাস উঁকি মারে। যখন দেখি, অনিন্দ্যসুন্দরী বোন দু'জনের নিরাপত্তার অভাব। বাবার এই সামান্য সম্পত্তির ওপরও প্রমোটারের শকুন-নজর। দারিদ্র্য হেতু ভাইটি আমার কলেজে পদে পদে অপদস্থ হয়। সাত্ত্বিক বাবা আমার অসহ্য যন্ত্রণায় রাতদিন ছটফট করেন। তখন কিন্তু মন্দিরের মা-র চোখ তিনটিকে নিতান্ত পাথরের মনে হয়।

তবু বলব, বিশ্বাস হারাবেন না। যথা সময়ে দেখবেন, তিনি ঠিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। সেটা হবে আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত।

মা কি আমার ঘরে টাকা পৌঁছে দেবেন? শ্রবণা বাস্তব দৈন্যদশা জানাল, জানেন বাবা হঠাৎ মারা গেলে ওঁকে দাহ করার টাকাটা পর্যন্ত এই মুহূর্তে আমার হাতে নেই।

ঘটলও তাই। দর্পণদা ফের কোনো অভয়বাণী শোনানোর আগে ভেতর-ঘর থেকে বুকফাটা সম্মিলিত মরা-কান্না ভেসে এলো। শ্রবণা বিদ্যুৎবেগে ছুটে যেতে কান্নার শব্দ আরও উচ্চকিত হল।

দর্পণদা রীতিমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দীর্ঘক্ষণ।

হঠাৎ ভেতর দরজা দিয়ে মস্তান গোছের একজন এসে বলল, বিক্রিবাট্টা বন্ধ। আপনি মোশাই অন্য দোকান দেখুন। ঝাঁপ ফেলে ডেড বডির হিল্লেয় যেতে হবে। জলদি ফুটুন।

দর্পণদা এক মুহূর্তে ভাবল, সব কিছুতো ইচ্ছা নির্ভর। এই জন্যই হয়তো খড়ম জোড়া পাওয়া যায়নি। তারপর দ্বিধা সংকোচহীন ভেতর দরজা দিয়ে নির্ভীক পা বাড়াল।

সুজন, এই হল দর্পণদা। আশ্চর্যরকম অন্যমুখী হয়ে গেল। যার লেখার খাতায় পড়েছিলাম, পার্থিব এই জগতে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অধিক। দুঃখ কারও কাম্য নয়। তাই মানুষ এই দুঃখ থেকে নিবৃত্তির পথ খুঁজেছিল। মনে ধর্ম-জিজ্ঞাসা জেগেছিল। কল্পনা করেছিল, দৃশ্যমান এই জগতের ওপর আসীন অসীম শক্তিধর সৃষ্টিকর্তাকে। ভেবেছিল, হয়তো বা পরম অনুকম্পাময় সর্বশক্তিমান বুদ্ধিমান সেই কিছুটা জানা-অজানার আশ্রয়েই বুঝি বা দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব। এই দুর্জ্ঞেয় শক্তিই মানুষের কাছে পরমেশ্বর ঈশ্বর আল্লাহ্ পরমপিতা।

আদিতে মানুষ ছিল এক জাতি। পরে বিভিন্ন জনপদে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নানা ভাষা গোত্র গোষ্ঠীভেদে পরস্পরের বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। তখন থেকেই আবির্ভাব শুরু, বিভিন্ন দেশকাল সুসংবাদদাতা পথপ্রদর্শক সতর্ককারী আর নানা পুরুষের। ওঁরা নাকি সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত প্রতিনিধি। ওঁরা যেসব নীতি অবলম্বন করে সাধনার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছিলেন তাকেই ধর্ম বা ধর্মনীতি বলা হয়। এই অভিপ্রায় অনুসারে বহুধা বিভক্ত মানুষ নিজেদেরকে ভিন্নতর পথে চালিত করতে সচেষ্ট। পথ একাধিক হলেও লক্ষ্য একটাই। সেটা হল, দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভ।

নানা মুনির নানা মত। যত মত তত পথ। ভারতীয় সাধকেরা বললেন, এই জগত একটি মায়াবিশেষ। যা বহু ও বিচিত্র মনে হচ্ছে তা একই সৎবস্তুর বিকারমাত্র। সুখ দুঃখ বলে কিছু নেই। এ সবই মায়ার কান্ড। এই মায়াকে অতিক্রম করে বিশুদ্ধ অবিকৃত সত্তার অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগতেই পারে, সংসার ত্যাগী সাধুরও তো ক্ষুধা পায়। খাদ্যাভাবে কষ্ট হয়। অন্নবস্ত্রের অভাব বোধ করে। এসব কি প্রমাণ করে না যে, সাধুর প্রাণেও মায়া থাকে। অভিষ্ট সিদ্ধ না হলে দুঃখ ক্রোধ বিকার লক্ষ্য করা যায়। তাহলে, মায়ার জগত ছাড়িয়ে যাওয়া কতদূর সম্ভব?

আল্লাহ্-য় বিশ্বাসী নবীদের অভিমত, পার্থিব জীবন হল ক্রীড়া-কৌতুক জাঁকজমক পারস্পরিক শ্লাঘা আর ধনে জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা মাত্র। এই জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতএব কল্পিত লোভনীয় এক জগতের বর্ণনা দিয়ে বলা হল, সেই লক্ষ্যস্থল পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণগুলি তুচ্ছাতিতুচ্ছ মাত্র। সেখানেই যা কিছু আলো। প্রার্থিত হোক, পার্থিব এই জীবনের অন্ধকার থেকে সেই আলোক-উজ্জ্বল রমণীয় স্থলে উত্তরণের।

যীশু কিন্তু দৃশ্যমান এই জগত তথা পার্থিব জীবনকে মায়া না বলে সত্য বলে স্বীকার করলেন। বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করলে মানুষের জীবনে দুঃখ

অনিবার্য। তাই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হল, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যথাযথভাবে পালন করা। তিনি ইহকাল ও পরকাল, স্বর্গ ও পৃথিবী, পার্থিব ও পারমার্থিক জীবনের আলাদা অস্তিত্বে রেখা রচনায় প্রয়াসী ছিলেন না। ভূতলে স্বর্গ রাজ্যের জন্য আকাঙ্খা ও উপায়ের নির্দেশ দিয়েছেন মাত্র।

তত্ত্বনিষ্ঠ ধর্মের মধ্যেও সত্য বিদ্যমান। সমাজের মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ তার মূলে থাকে স্বার্থ। স্বার্থের মূলে কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি ছয় রিপুর তাড়না। যে কোনো ধর্মের অন্যতম কাজই হল, অনভিপ্রেত এই সংঘর্ষের শিকড় উৎপাটন করা।

ভারতীয় সাধকেরা বাহ্য বিষয় থেকে সমুদয় ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার প্রসঙ্গে বলেছেন, দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভের জন্য 'দম' বা বাহিরিন্দ্র নিগ্রহ হল যথার্থ পথ।

মোসলমান ধর্মে মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য সৎ কাজ সৎ জীবন ও আত্মসংযমকে শ্রেষ্ঠ উপায় বলা হয়েছে। খৃষ্টধর্মে মানুষের মধ্যে পরস্পর প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সহানুভূতি ক্ষমা উদারতা এবং হৃদয়ের প্রশস্ততার কথা উপদেশে আছে। চ্যারিটি সাধনার সহায়ক হল প্রেম। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাই তুমি যেমনটি অনুভব কর আমি তেমনই অনুভব করব। তোমার সুখে সুখি হব। দুঃখে দুঃখী হব। আমার প্রতি তোমার কোনো অন্যায় অপরাধে ক্রোধের পরিবর্তে মনঃকষ্ট হবে। প্রতিশোধের ইচ্ছা হবে না। বড়জোর তোমার ভুল ধরে দেখাব। তোমার জন্য আমার হৃদয়ের দুয়ার খোলাই থাকবে।'

সুজন, এই অব্দি পড়ার পর হঠাৎ কেন জানি না তোমাকে মনে পড়ে গিয়েছিল। পড়া থামিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। ভাবলাম, তোমার নিশ্চয়ই এসব পড়া আছে। আমি পুনরায় পড়তে শুরু করলাম।

'তুমি মানুষ আমিও মানুষ। তুমি প্রাণী আমিও প্রাণী। তুমি পরমেশ্বরের একটি সৃষ্টি, আমিও তাই। অতএব, তোমাকে আমি ভালোবাসি। হয়তো এইসব কারণে ভালোবাসি অথবা বিনা কারণেই ভালোবাসি। কেননা, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসার অসামান্য আকাঙ্খা দিয়েছেন, অতএব, তোমাকে ভালোবাসব।' এটা মানুষের স্ব-ভাব। স্ব-ভাব বলেই মানুষের পক্ষে অনায়াস সাধ্য ও সুখকর। প্রেম ভালোবাসা অপর কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। প্রেম সাধনার বৈশিষ্ট্য হল, যে প্রেম পায় সে তো সুখি বটেই যে দেয় সেও ধন্য হয়। 'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি ছিদ্যতে সর্ব সংশয়ঃ।' সেই অবস্থায় সমগ্র জগত মধুময় হয়ে যায়। 'মধুবাতা হৃদয়েতে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবর মধুবৎ পার্থিবং রজঃ।' ধর্মের পথ মত নিয়মাবলী ভিন্নতর হলেও লক্ষ্য এক, পার্থিব জীবনে সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠা। এই সুখ শান্তির জন্য চাই প্রেম ভালোবাসা। প্রেম ভালোবাসার জন্য ঈশ্বরানুগ হওয়া দরকার। তবেই দুঃখ-উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব।

সুজন, লেখাটা আমি মিঃ মুস্তাফীকে পড়তে বলেছিলাম।

আমার অত ধৈর্য নেই। মিঃ মুস্তফী বলল, ভালো পাঠক না হলেও শোনায়

যথেষ্ট ধৈর্য রাখি। সেজন্য যে যা বলে, নীরব শ্রোতা হয়ে শুনি। শুনেও কিন্তু কম কিছু শিখিনি।

তাহলে আমি পড়ব কী? আমি জানতে চাইলাম।

মিঃ মুস্তাফী রাজি হওয়ায় আমি পড়লাম। একবার শুনে ওর মন ভরল না। আবার পড়তে বলল। এরকম অনুরোধে মোট চারবার আমাকে পড়তে হল। ওর সুমুখের গেলাসে তখন দ্বিতীয় পেগের অর্ধেক খরচ হয়েছে। অর্থাৎ কিনা ঠিকঠাক আলাপই শুরু হয়নি। অথচ আশ্চর্য, চোখ বুজে কেমন যেন উচ্চ মার্গে পৌঁছে গেছে মনে হল। আমি ইচ্ছে করেই বিঘ্ন ঘটালাম না। চুপচাপ বসে রইলাম। দীর্ঘক্ষণ। তারপর আকন্ঠ পান করে বুঁদ হয়ে থাকলে অনেক সময় যেমনটি করে থাকি ঠিক তেমনটি করলাম। ওকে সযত্নে সোফায় শুইয়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষে সেলফোনে মিঃ মুস্তাফীর ডাক এলো। আদুরে শিশু-স্বরে জিগ্যেস করল, আজ তোমার হাতে কাজ কেমন আছে?

কেন?

ছুটি করতে পারবে? তাহলে আমিও অফিসে যাব না।

তারপর?

বেলুড় দক্ষিণেশ্বর যাব। এতদিন কোলকাতায় আছি, যাইনি কোনোদিন।

শেষ কবে গেছি আমারও মনে নেই। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময়টা আমার সবচাইতে বেশি পছন্দ। কাঁসর ঘন্টা ঢাক শঙ্খ শব্দে যেন যাদু আছে। পঞ্চপ্রদীপের শিখা আর ধূপের সুবাসিত ধোঁয়ায় নিশ্চুপ আবিষ্ট হয়ে মনে হতো, যেন এক পরম পবিত্র আনন্দভূমিতে পৌঁছে গেছি।

সে নাহয় আর একদিন যাওয়া যাবে। মিঃ মুস্তাফী আব্দারের ঢঙে বলল, আজ সকালেই চল, প্লীজ। ভাবছি, পূজা দেব। তারপর বেলুড় হয়ে অন্য কোথাও গিয়ে দুপুরের লাঞ্চ খাওয়া যাবে।

তার চাইতে বরং আদ্যাপীঠে যাওয়া যাবে। ওখানে দুপুরে ভরপেট ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

আদ্যাপীঠ কোথায়?

দক্ষিণেশ্বরের কাছেই, আড়িয়াদহে।

বেশ তাই হবে, তুমি যেমনটি বলবে। মিঃ মুস্তাফী জিগ্যেস করলেন, আমার তো ধুতি নেই কি পরে যাব? স্যুট পরে যাওয়া কি ঠিক হবে?

স্যুট পরে যাওয়ায় কোনো বাধা নেই। তবু, তুমি কুর্তা পায়জামা পরে যেও। যেটা তোমার জন্মদিনে কিনে দিয়েছি।

ওকে।

সুজন, সেদিনটা আমাদের অদ্ভুত সুখানুভূতিতে কেটেছিল। মিঃ মুস্তাফীকে অন্য

এক মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করেছিলাম। মনে হল, ওর ভেতর দারুণ কিছু একটা পরিবর্তনের গোপন খেলা শুরু হয়ে গেছে। সম্ভবত অন্যমুখি মানুষ হতে চলেছে মিঃ মুস্তাফীও।

আমার অনুমান যে যথার্থ তা টের পেলাম বেলুড় মঠ ঘুরে বিকেলে গঙ্গার ধারে বসে। শীতল নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে মিঃ মুস্তাফী একসময় বলল, তোমার দর্পণদাতো অনেক ধর্মের বই পড়ে বলেছিলে। আমাকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পড়ে শোনাবে?

নিশ্চয়ই শোনাব।

একদিন সন্ধ্যারতির সময় আসবে?

তুমি বললেই, আসব।

কিছুদিনের জন্য কোনো নির্জন অরণ্য অথবা নদীর ধারে থাকব ভাবছি। যাবে তুমি?

যাব। এত প্রশ্ন কেন? তুমি যখন যেখানে যেতে বলেছ গিয়েছি তো। ভবিষ্যতেও যাব এবং সঙ্গে থাকব। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। আই অ্যাম অলওয়েজ এ্যাট ইউর সার্ভিস।

ওভাবে বলো না মৌ। কেমন যেন কর্মী কর্মী গন্ধ।

অভিনেত্রীর ভূমিকায় তাইতো।

প্রথম পর্বে হয়তো তাই ছিলে। এখন তো তেমনটি নেই।

এখন তাহলে কি আমি?

নিঃসঙ্গের সঙ্গ। শূন্যতায় পরিপূর্ণতা। চিত্ত জাগরণের উৎস। সৃষ্টির নিশ্চিত আশ্রয়। হারিয়ে যাওয়ার হাতছানি। তুমি যে আমাকে ভালোবাস সে কি বুঝি না আমি।

কেমন করে বুঝলে?

তা নাহলে কবেই উড়ে যেতে তুমি।

কার সঙ্গে উড়ে যাব? তেমন মনের মানুষ পেলে তো তবে।

একজনও পাওনি।

দর্পণদা একদিন বুঝিয়েছিল, উন্নত মানুষ অর্থে ধনসম্পদ আর পুঁথিগত বিদ্যা বোঝায় না। কর্মযোগে নির্মল মন সুস্বাস্থ্য আর উন্নততর চিন্তাভাবনার অধিকারীরাই প্রকৃত অর্থে যথার্থ মানুষ। তোমার ভেতর তেমন মানুষ কিছুটা দেখতে পেয়েছি বলেই ছাড়তে পারিনি।

আমার কি মনে হয় জান? মনে হয়, ধন অপেক্ষা বদান্যতা স্বজনের চাইতে সুকৃত ঢের ভালো। সিঞ্চিতা থেকে মৌমিতা শ্রেয়।

সুজন, তুমি আমাদের দোতলার ছোট ঘরে লোভকে জয় করতে পারনি। লোভ থেকে আকাঙ্খা অভিলাষ লালসা আসে। লজ্জা উবে যায়। ভয় ভাঙে। কঠিন সংযম

কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারাই তলিয়ে যাওয়ার থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ভেবে দেখ, মিঃ মুস্তাফীর সঙ্গে তোমার তফাতটা কোথায়।

মিঃ মুস্তাফী বলল, আজ আমি একটাও সিগারেট খাইনি মৌ। মদ্যপানও কমিয়ে দেব। তারপর পারলে একদম ছেড়েও দেব ভাবছি। কাল তুমি যখন ফিরে গেলে তখন কিন্তু আমি ঘুমিয়ে ছিলাম না। দেড় পেগে আমি যে বেসামাল হওয়ার নয় তা তোমার বোঝা উচিত ছিল।

তাহলে আমাকে কিছু বলনি কেন। কি হয়েছিল তোমার?

ভাবছিলাম। অনেক গভীরে ডুব দিয়ে আত্মমগ্ন আমার সামনে তুমি কিন্তু আদৌ ছিলে না। তাই থাকা বা চলে যাওয়া সমান ছিল। কাল সারারাত আমি ভেবেছি। ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, অফিস বাড়ি পার্টি আড্ডা মদ্যপান ইত্যাদি নিয়ে যে গতানুগতিক জীবন জগৎ তা থেকে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি মুক্তি নেব। একঘেয়েমিতে আমার বিরক্তি এসে গেছে। মনকে আমি ঈশ্বরমুখী কল্যাণমুখী করতে চাই। তুমি সঙ্গিনী থাকবে তো।

আমি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লাম। আবেগ আপ্লুত বললাম, নিশ্চয়ই থাকব। পরক্ষণেই দর্পণদাকে বিশেষ করে মনে পড়ল। মনে হল, কোথায় যেন দু'জনে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

আমার একটা পরামর্শ তুমি যাচাই করে দেখতে পার। মিঃ মুস্তাফীকে আমি বোঝালাম, আমি তো ছিলাম আছি থাকব। তবু আর একজনকে তুমি সঙ্গে নিতে পার।

কে সে?

আমার দর্পণদা। যে তোমাকে চোখে না দেখেও চেনে। বিনা আলাপ পরিচয়েও আমার চাইতে তোমাকে অনেক বেশি বোঝে। ওর নীরব সম্মতি ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক বজায় রাখা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

তাহলে তো অনেক আগেই আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয়া উচিত ছিল।

তখন তো তুমি আজকের এই পরিবর্তিত মানসিকতার মানুষ ছিলে না।

ঠিক বলেছো। এতদিন মান থাকলেও আমার হুঁশের অভাব ছিল। ত্রুটিটা ধরিয়ে দিয়েছে তোমার দর্পণদার ওই লেখাটা। উনিই হবেন আমার গুরু।

সুজন, 'ঐশ্বর্যের গর্বে মোহান্ধ মানুষ সজ্জন ব্যক্তিকেও অবজ্ঞা করে।' দর্পণদাতো কোনোদিন তোমার দয়া দাক্ষিণ্য চায়নি। তবু, তুমি ওকে অবজ্ঞা করে দূরে সরে থেকেছো। 'ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করতে ব্যাপৃত মানুষেরা প্রায়ই প্রমত্ত হয়ে স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করে।' তুমি তেমনি একজন। আজও বুঝতে শিখলে না 'যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁর কল্যাণ হয়।'

শুধু একা দর্পণদা নয়। ভবানীপুরের অনন্য খিদিরপুরের নিগূঢ় শিবপুরের জয়েশ লিলুয়ার নিরুক্ত আর সাত্রাগাছির প্রত্যুষকেও তোমার সজ্জন বা শ্রেয় মনে হয়নি। তাইতো ওরা এখন কে কোথায় কেমন আছে খোঁজ রাখ না। দর্পণদার সঙ্গে কিন্তু এখনও যোগাযোগ আছে।

লিলুয়ার নিগূঢ় ওর বোনের বিয়েতে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল। আশা ছিল, যে সেখানে উচ্চ মধ্য নিম্ন বৃত্তিতে নিকটদূরে বিচ্ছিন্ন থাকুক না কেন সম্মিলিত হবে। পুনর্মিলন উৎসবের মতো বাড়তি আনন্দ স্বাদ পাওয়া যাবে। এসেছিলও সকলে। অনুপস্থিত একমাত্র একজনই ছিল। জানি না সে নিজেকে প্রতিভাধর খ্যাতনামা সাহিত্যিক চিন্তাবিদ্‌দের অন্যতম একজন মনে করে বলেই এই ব্যতিক্রম আচরণ ছিল কিনা।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, 'অনুতাপানলে পুড়ে মানুষ পবিত্র হয়' মাঝে মাঝে ভাবি, আর কারও জন্য নাহলেও সেবন্তীর প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য তোমার অনুতাপ হবে কবে।

সেবন্তী সময় সুযোগ পেলেই দর্পণদার অফিসে এসে গল্প করে যায়। দু চারটে সুখ দুঃখের কথা বলে। নারী কল্যাণ সমিতি সম্পর্কে মতামত বিনিময় করে। কিন্তু তোমার প্রসঙ্গে একটি বাক্যও খরচ করে না।

সুজন, মিঃ মুস্তাফীর সঙ্গে দর্পণদার প্রথম সাক্ষাতের স্থান নির্দ্ধারিত হয়েছিল বৈদ্যবাটি আর শেওড়াফুলি স্টেশনের মাঝবরাবর এক বাড়িতে। উদ্দেশ্য ছিল, সারাটা দিন সবাই মিলে ছোটখাটো একটা আউটিং-এর আনন্দ উপভোগ করা যাবে। সবাই মিলে অর্থে কল্পিতাও যাবে।

মিঃ মুস্তাফী গাড়ি পাঠাতে চেয়েছিল। দর্পণদা বুঝিয়েছে, হাওড়া থেকে বৈদ্যবাটি পৌঁছাতে হলে সড়ক পথের চাইতে ট্রেনই ভালো। ধকল পড়বে না। সময় কম লাগবে। সেই মতে বৈদ্যবাটি রেলস্টেশনে গাড়ি ছিল।

স্টেশন থেকে জি টি রোড ধরে চাপদানি-ভদ্রেশ্বরের সামান্য এগিয়ে গেলে জোড়া অশ্বত্থতলা। সেখান থেকে ডান দিকে গঙ্গা সমান্তরালে শরৎচন্দ্র মুখার্জী রোড। চলতি পথে ঘাট হি ঘাট। হাতিশালা শ্মশান ঘাট, নিমাইতীর্থ ঘাট, পোদ্দার ঘাট, শ্যামা চ্যাটার্জী ঘাট।

গঙ্গার ধার ঘেঁষা বিশাল বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি থামল।

বাড়িটা কিন্তু আমার পৈত্রিক না। প্রতীক্ষারত মিঃ মুস্তাফী সাদর অভ্যর্থনা সেরে বলল, সম্ভবত ইংরেজ আমলে কোনো জমিদারের ছিল। উত্তরসূরী অপদার্থ কুসন্তানরা বেঁচে দিয়ে থাকতে পারে। তারপরও তিন হাত বদল হয়ে এখন আমার। হালে কিনেছি।

এখানে কিনলেন কেন? দর্পণদা কিছু একটা অনুমান করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে বলল, আপনার অফিস তো কলকাতায়।

ফ্ল্যাটবাড়ি আমার ভাল্লাগে না। তা ছাড়া একটা স্বপ্ন জুড়ে আছে এর সঙ্গে।

কি সেই স্বপ্ন? আমাকে আগাম না জানানোয় ক্ষুব্ধ হলেও ধরা দিলাম না।

এই বাড়ির সম্পত্তির সঙ্গে একই মালিকের কাছ থেকে ষাট বিঘা ক্ষেতজমিও কিনেছি আমি। সেখানে খামার বাড়ি করার ইচ্ছা আছে।

সেই জমি কোথায়? দর্পণদা জানতে চাইল।

নালিকুলে।

নামটা শুনেছি। কোথায় যেন?

শেওড়াফুলি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া তারকেশ্বর লাইনে। কল্পিতা গর্ব করে জানালো, দিয়াড়া, নসীবপুর, সিঙ্গুর, কামারকুণ্ডু তারপরের স্টেশন। ওখানকার ডাকাতকালী খুউব বিখ্যাত।

তুই এত কিছু জানিস কেমন করে? আমি জিগ্যেস করলাম।

এককালে আমার মামা থাকত যে।

এখন নেই? দর্পণদা জানতে চাইল।

ন্নাহ্। পার্টি করত তো, তাই খুন হয়ে গেছে। সেই থেকে কে কোথায় পালিয়ে গেছে কিছু জানি না।

এলাহি চা জলখাবারের পর্ব সেরে মিঃ মুস্তাফী বলল, চলুন চারদিকটা একবার ঘুরে দেখবেন।

অজস্র গাছগাছালি আর পুকুর নিয়ে বাস্তুটা অন্তত পাঁচবিঘা হবে। চুনসুরকিতে গাঁথা প্রাসাদবাটিটায় অনেকগুলি বড় বড় ঘর। বিশাল বিশাল দরজা জানলা। গঙ্গার জল ছুঁয়ে এমন ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঘরে ঢোকে যে বিদ্যুৎ-পাখার দরকার হয় না।

অন্দরমহল ছাড়িয়ে ভেতরে বাঁধানো প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের ওপারে ভগ্নপ্রায় নাটমন্দির। অপর দুদিকে এককালে চাকর বাকর দাসদাসীদের বসবাস ঘর। এখন খন্ডহার।

অন্দরমহল থেকে একটা সুড়ঙ্গপথ সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমেছে। এঁকে বেঁকে গঙ্গা অব্দি গিয়েছে। সেখানে আকরিক লোহায় তৈরি ফটক তালা বন্ধ। এখনও যথেষ্ট মজবুত। ফটকের এপারে উঁচু বেদীর উপর ছোট স্নানঘর। সর্বক্ষণ জলে ডুবে থাকে। এপারে রোদ ঝিকমিক জলে ছিপ নৌকা দাঁড়িয়ে।

এখন ফাল্গুন মাস। দক্ষিণা বাতাসে আমের মঞ্জুরী আর বাতাবি লেবু ফুলের সুবাস।

জায়গাটা কেমন লাগছে তোমার কল্পিতা। ফিরে এসে মিঃ মুস্তাফী প্রথম ওকেই জিগ্যেস করল।

ভালো। কল্পিতা লাজুক হেসে বলল।

তোমার? এবার প্রশ্নটা আমাকে।

দা-র-উন। আমি উচ্ছ্বাসে বললাম, এখানে দু'চারদিন থাকলে কাসুন্দিয়ায় ফিরতেই ইচ্ছে করবে না। এত কাম এ্যান্ড কোয়াইট ফেলে ভিড়ভাট্টা হৈ হট্টগোল কার বা ভালো লাগে।

থাকবে, থাকবে। বেশ কিছু সংস্কার করতে হবে, তারপর।

এবার আপনি বলুন। সবশেষে দর্পণদাকে বলল, এই বাড়ি নিয়ে নানা রকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি আমি। কোনো সিদ্ধান্ত এখনও নিতে পারছি না। আই নীড ইউর সাজেশান। আগে বলুন পরিবেশটা আপনার কেমন লাগছে।

দেখুন, ছোটবেলা থেকেই আমি প্রকৃতিপ্রেমী। দর্পণদা ভাবাবেগ আপ্লুত বলল, নিরিবিলি, নির্জনতা আমার বেশি পছন্দ। সেই জন্য গ্রাম থেকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পেলে সাড়া না দিয়ে পারি না। স্বভাবতই বুঝতে পারছেন, এই জায়গাও আমার অবশ্যই ভালো লাগছে। বিশেষত সামনে ওই নদীটার জন্য। পাহাড় সমুদ্র নদী অরণ্য এই চার জায়গার মধ্যে আমার প্রথম পছন্দ নদী। আমাদের দেশে শিল্পবাণিজ্য শহর মন্দির তীর্থস্থান ইত্যাদি অধিকাংশই তো গঙ্গা নদীর তীরে।

আমার মতো একই আরও একটা কারণে জায়গাটা তোমার ভালো লাগছে। আমি দর্পণদাকে স্মরণ করাতে বললাম, সেটা কিন্তু তুমি বললে না।

কোনটা?

নিস্তব্ধতা। সেটা কিন্তু এখানে আছে। দূরে কোথাও না গিয়ে সেই প্রয়োজনটা কিন্তু এত কাছেই এসে মোটামুটি মিটিয়ে নেয়া যায়।

কোন প্রয়োজনটা?

বলেছিলে, গতানুগতিক জগৎ থেকে কিছুদিনের জন্য নিরিবিলি নির্জনে গিয়ে থাকা দরকার। নীরবতায় মনের বিশ্রাম হয়। নিস্তব্ধতায় প্রশান্তি আসে। একাগ্রতা আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা আর আভ্যন্তরীণ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য নির্বাক নিস্তব্ধতা প্রয়োজন।

বলেছি। কিন্তু আমার কথা নয়। পড়ে মনে ধরেছিল তাই।

তাই আমাদের মনেও গেঁথে দিতে চেয়েছো, সে তো ভালো কথা। আমি মিঃ মুস্তাফীকে বললাম, সেদিন যদি ওই লেখাটা আমি না পড়ে শোনাতাম তাহলে তুমি কি আর অন্যমুখি ভাবনা চিন্তা শুরু করতে। দর্পণদাকেও এভাবে ডাকতে না।

ঠিকইতো। মিঃ মুস্তাফী আমাকে সমর্থন করে বলল, গুরু ধরেই তো সাধারণ মানুষেরা শেখে। আমি অন্য জগতের মানুষ। অন্য জগতের কিছু জানতে বুঝতে শিখতে হলে কারও সাহায্য তো নিতেই হবে। সেই সাহায্যটা আপনার কাছ থেকে পাব বলেই তো এভাবে সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়েছি।

কি সেই সাহায্য? দর্পণদা জানতে চাইল।

বলব, তবে এখন নয়। দুপুরের লাঞ্চের পর।

হোটেলে আগাম অর্ডার দেয়া ছিল। ঠিক সময়ে ড্রাইভার গিয়ে খাবার নিয়ে এলো।

খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পর মিঃ মুস্তাফী বলল, এবার তাহলে কাজের কথা শুরু করি?

প্রশ্নটা দর্পণদাকে। তাই দর্পণদা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

মিঃ মুস্তাফী বলল, আমার পারিবারিক জীবন আর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে মৌমিতার মুখ থেকে নিশ্চয়ই মোটামুটি শুনে থাকবেন। তবু—

এক মিনিট। দর্পণদা থামিয়ে দিয়ে কল্পিতাকে বলল, তুই বরং সামনে ওই নদীর ধারটায় একটু বেড়িয়ে আয়। চাপচাপ ভালো লাগছে না নিশ্চয়ই।

নদীর ধারে আর একা কতক্ষণ ঘুরবে! মিঃ মুস্তাফী সঠিক অনুমান করে হাঁক দিয়ে ড্রাইভারকে ডাকল। বলল মামণিকে নিয়ে শ্রীরামপুরের গঙ্গার ধারটা একবার ঘুরিয়ে আনো। অনেক কিছু দেখার আছে।

সুজন, শ্রীরামপুর বলতে 'গঙ্গামুখি' ফ্ল্যাটে সিঞ্চিতাকে মনে পড়ল।

ওরা চলে যেতে দর্পণদা বলল, মৌ আমাকে সবই বলে। সেই থেকে আমার ধারণা জন্মেছে, আপনি একজন নিঃসঙ্গ দুঃখী মানুষ। মৌ সঙ্গ দেয় বলেই আপনি এখনও ঠিকঠাক আছেন। ও নিজেকে সরিয়ে নিলে হয়তো আপনার বেঁচে থাকা সম্ভব নাও হতে পারে। মৌ অতুলনীয়া। অথবা তপস্বিনী।

ঠিক তাই। মিঃ মুস্তাফী বিষণ্ণ ঠোঁটে বলল, আমার প্রতি ওর বিশ্বাসের মূলে কিন্তু আপনি। আপনিও অবশ্যই অতুলনীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

এবার বলুন কি সাজেশান চাইছেন আপনি।

আমার পরিকল্পনা ছিল, রিটায়ার লাইফে নালিকুলের খামার বাড়িতে থাকব। চাষবাস নিয়ে সময় কাটাব। আর এই বাড়িটাতে একটা প্রসূতিসদন করব। ইদানিং স্থির করেছি চাকরিটা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেব।

কেন?

ভালো লাগছে না। রোজগারের কি দরকার। কে আছে আমার? এই কে আছে আমার ভাবতেই মনে হল, কচিকাঁচাদের জন্য স্কুল করলে মন্দ হয় না। পরে ভাবলাম, নির্যাতিতা ঘর ছাড়া মেয়েদের জন্য আশ্রয় আবাস করব। সবশেষে যে চিন্তাটা মাথায় ঘুরছে সেটা হল, ধর্ষিতাদের জন্য কিছু একটা করা। লিলুয়ার হোমের মতো না। এমন অনেক ধর্ষিতা আছে যাদেরকে অভিভাবক ফিরে পেতে চায় না। বাধ্য হয়ে ওদেরকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। নয়তো অনাকাঙ্খিত বৃত্তিজীবন বেছে নিতে হয়। ওদের জন্য যদি হাতের কাজ শেখার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি তাহলে বোধহয় স্বনির্ভর হয়ে সমাজের স্বাভাবিক সাধারণ স্রোতে মিশে যেতে পারে। কোনো

শক্তিই ওদেরকে ব্রাত্য করে রাখতে পারবে না। এবার আপনি বলুন কোনটা বেছে নেব?

সবগুলিই ভালো। কিন্তু কথা হল, আপনার অর্থবল জনবল কতটুকু?

অর্থের কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। একমাত্র উত্তরাধিকারী আমার উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট বিষয় আশয় আছে। বিভিন্ন খাতে সুদে আসলে সঞ্চয়টাও কম নয়। অবসর নিলে যে অঙ্কের টাকা পাব সেটাও কম হবে না। একবার শুরু করতে পারলে চাকরি সূত্রে যতটুকু পরিচিতি আছে তাতে স্বদেশ বিদেশ থেকে ভালো ডোনেশনও আসবে আশা করি। তা ছাড়া, ওই যে আপনি বলছিলেন সেই একাগ্রতা আর আভ্যন্তরীণ শক্তি সঞ্চয়ে হবে না?

অবশ্যই হবে। দর্পণদার চোখ মুখ উজ্জ্বল হল। বলল, আপনি তো দেখছি অভ্যন্তরীণ শক্তিসঞ্চয় করেই ফেলেছেন। এখন দরকার সেই শক্তি সঠিক প্রয়োগ আর একাগ্রতা।

সুজন, সেদিন 'মুখর মেলা'র মঞ্চে তোমাদের সম্মিলিত রায় ছিল, সমাজ যেহেতু বিকল্প জীবিকার সন্ধান দিতে অক্ষম তাই এই ব্যবসাকে 'নৈতিক' বলে মেনে নেয়া দরকার। আশ্চর্য তোমরা চিন্তাবিদ প্রতিভাধর গুণীজন। বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারে সে সম্পর্কে তোমরাও কিন্তু কোনো কিছু বললে না। আর যারা প্রতারিত বিক্রিত পথভ্রান্ত আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভীতি প্রদর্শনে বাধ্য? ওরা তো অন্যমুখি জীবনে ফিরতে পাখির ডানা ঝাপটায়। অসম্ভব কষ্ট বুকে নিঃশব্দে কাঁদে। ওদের সম্পর্কে তোমাদের রায় অব্যক্তই থেকে গেল। তোমরা শুধু ব্যবসা আর ব্যবসায়ীদের অনুকূলে প্রচার করে নিজেরাও প্রচারিত হলে।

নিজেরাও প্রচারিত নয় কি? অন্তত তোমার বেলায় ষোল আনা সত্যি।

দর্পণদা তোমাকে একদিন বলেছিল শুনেছি, অতি বেশি লেখার জন্য গুণগত মান নিম্নমুখি হয়ে পড়ছে। কি দরকার তোর এত বেশি লেখার?

উত্তরে তুমি বলেছো, সময়ের ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলে উপায় কি আছে। এখন কোয়ালিটি নয়। কোয়ানটিটি চাই। নিরন্তর দশ জায়গায় না লিখলে পাঠক পাঠিকারা লেখকের নামটা ভুলতে বসে। ভাবে, আর দেয়ার কিছু নেই, ফুরিয়ে গেছে। সেজন্য ওদের চোখের সামনে সর্বদা নামটা যাতে ভাসে সেই ব্যবস্থা রাখতে হয়। নৈলে প্রতিষ্ঠা বৃন্ত থেকে ছিটকে গিয়ে নিজেকেই ভেসে হারিয়ে যেতে হবে।

সুজন, বৈদ্যবাটি গঙ্গার ধারে আবাসিক নারী কুটির শিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 'দৃষ্টান্ত' একটি পরিচিত নাম।

প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র সেই শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত যারা ওই অনিচ্ছাকৃত বাধ্য হওয়া জীবন থেকে মুক্ত হয়ে অন্যমুখি বৃত্তি প্রত্যাশী। 'দৃষ্টান্ত'র কর্মাধ্যক্ষ দর্পণ দত্ত বা ওর সহকারী শ্রবণা দত্ত কেউই 'মুখর মেলা'য় আমন্ত্রিত অতিথি বিবেচিত হয়নি।

সম্ভবত ওদের ভূমিকা সম্পর্কে উদ্যোক্তারা কিছুই জানে না। আলোকিত ব্যক্তিত্ব নয় বলে।

'দৃষ্টান্ত' থেকে শরৎচন্দ্র মুখার্জী রোড শেওড়াফুলি চাতরা হয়ে শ্রীরামপুর অব্দি চলে গেছে। এই রাস্তার ধারেই 'গঙ্গামুখি' বহুতল বাড়ি। দু'বাড়ির বাসিন্দা শ্রবণা আর সিঞ্চিতায় বিস্তর ফারাক। যেমনটি তোমার আর দর্পণদার। কিন্তু সময়ে সকলেই গঙ্গামুখি দৃষ্টি মেলে সুমুখের দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। ফেরিঘাট ভিন্নতর হলেও গন্তব্যস্থান হয়ে যায় এক, ব্যারাকপুর।

ব্যারাকপুর মিশন স্কুলে পড়ে অবন। তুমি কখনও সখনও ওর সঙ্গে এপার থেকে ফেরি পেরিয়ে দেখা করতে যাও। সময় সুযোগ পেলে দর্পণদাও দেখা করে। সেবন্তী খোঁজখবর নিতে বলেছে তাই। একবার সেবন্তীর সঙ্গে ওই মিশনেই দর্পণদার দেখা হয়েছে।

দর্পণদার আমন্ত্রণে সেবন্তী সেদিন 'দৃষ্টান্ত' দেখতে এসেছিল, সঙ্গে অবন ছিল। ঘটনাচক্রে সেদিন আমিও ছিলাম।

সেই প্রথম অবনকে দেখলাম। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

আমি বললাম, কি নাম তোমার?

অবন চৌধুরী।

বাবার নাম?

অবন একবার সেবন্তীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, মার নাম সেবন্তী চৌধুরী।

আমি কিন্তু তোমার বাবার নাম জিগ্যেস করেছি।

বললাম তো, মা-র নাম। মা-ই আমার সব।

আমি বুঝলাম, অবন এই বয়স থেকেই সেবন্তীর সন্তান পরিচয়ে পরিচিতি হতে চায়। তবু প্রশ্ন জুড়লাম, বাবাতো তোমার সঙ্গে প্রায়ই স্কুলে দেখা করে শুনেছি। ভালেবাসে নিশ্চয়ই?

মাকে ভালোবাসে না। অবন সপ্রতিভ জবাব দিল, অনেকেই তো আমার সঙ্গে দেখা করতে যায়। দর্পণ জ্যেঠুও। ভালোওবাসে খুউব। ভালোবাসলেই বুঝি বাবা হয়।

তাহলে, কি করলে বাবা হওয়া যায়?

যেমন আমার সব বন্ধুর বাবারা করে।

আমি বোবা হয়ে গেলাম। মনে হল, কথায় হার মেনেছি। সেবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পুত্র গর্বে গরবিণীর উজ্জ্বল প্রকাশ।

সেবন্তী বলল, অনেককে বলতে শুনি, ছেলেটাকে দারুণ মিস করছি। আমাকে মিস করার কথা বলে না।

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ।

আমি বললাম, আসলে স্ত্রীর বিকল্প পাওয়া যায়। পুত্রের বিকল্প যে হয় না।

ভুল ধারণা। দর্পণদা শাস্ত্রকথা শোনাল, পুত্র পাঁচ প্রকার হয়। ভৃত্য, শিষ্য, পোষ্য, ঔরসজাত আর শরণাগত। অবন ঔরসজাত। বাকি চার শ্রেণিকে পিতৃস্নেহ আদর বাৎসল্যে বিকল্প পুত্র হিসেবে পাওয়া সম্ভব। সুজনের সে সবের বড়ই অভাব। দেহ আর ধনাদিতেই ওর যত আকর্ষণ। ওর দরকার সধুসঙ্গ। তেমন একজনও ওর বন্ধু নেই যে বোঝাবে, সব ক্ষেত্রেই ছোটরা বড়র পায়ে লুটিয়ে পড়বে এমন কোনো বিধান নেই। সময় বিশেষে উদার ক্ষমার হৃদয় চোখ নিয়ে ছোটর কাছে ছুটে যেতে হয়। রাগ অভিমান দূর করতে সস্নেহে বুকে টেনে নিতে হয়। এটা পরাজয় নয়, মহতের লক্ষণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হার মেনে নিয়েও পরাজিত অধীশ্বর হওয়া যায়।

সুজন, এমনতর মন মানসিকতার দর্পণদার সঙ্গে বন্ধু-সম্পর্ক তুমি এড়িয়ে গেছো। সাধুসঙ্গের প্রয়োজন বোধ করোনি।

দর্পণদার লেখার একটা অংশ মনে পড়ছে। কলমে বলছে, সময় দুরন্ত গতিময়। গতির তালে নিত্য বদলে যাওয়াই রীতি। তাই বলে, পরিবর্তন মাত্রই প্রগতি নয়।

অথচ, রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি....

চিরন্তন অন্তহীন চাওয়া। সংসার সমাজ কর্মক্ষেত্র—সর্বত্র শুধুই দেহি দেহি দেহি। তো শান্তি আসবে কোত্থেকে! কে বোঝাবে আর কজনই বা বোঝে যে, কোনো কিছু না চাওয়ার মধ্যেই শান্তি। যার নাম অমৃত লাভ।

দর্পণদাকে দেখি, অল্পতেই পরিতৃপ্ত। যতটুকু যা পায় তাতেই খুশি। প্রসঙ্গত হামেশা বলে, দিয়ে বলতে নেই। পেয়ে প্রচার করতে হয়। দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। পেয়ে কিছু দিতে না পারলে কষ্ট হয়। ভালোবাসার বেলাতেও তাই। কারও কাছ থেকে ভালোবাসা পেলে আনন্দ। দিতে পারলে আনন্দ। দিতে না পারলে নিরানন্দ। ভালোবাসাবাসিতে পরমানন্দ।

দর্পণদা 'অনির্বাণ' পত্রিকার দুটি সরলমনা নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে গভীর ভাব ব্যঞ্জনাময় একটা গল্প লিখেছিল। নাম দিয়েছিল 'পার্থিব'। গল্পটাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে বেরিয়ে এক রাখাল পুত্রের বাঁশির সুঁর রাজকন্যাকে ওর কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে একে অপরকে দেখেছিল। একে অপরকে নাম বলেছিল, 'রাজনন্দিনী নীলা' আর 'রাখাল নন্দন বংশী'।

বংশী জিগ্যেস করল, তুমি কোথায় থাক?

নীলা দূরে টিলার ওপর রাজপ্রাসাদ দেখিয়ে বলল, ওইখানে। যাবে তুমি?

না।

কেন?

ওখানে তো ধনীরা থাকে। গরীবঘরই আমার ভালো।

বেশ তাহলে আমাকেই না হয় সেখানে নিয়ে চল।

পথ চলতে নীলা বাঁশিটা হাতে নিয়ে দেখল, অনেক দিনের পুরনো বলেই তেল চিটচিটে চটা ঘষা। অপছন্দ হতে বলল, তোমাকে সোনায় বাঁধানো একটা সুন্দর বাঁশি দেব।

বংশী বিন্দুমাত্র পুলকিত না হয়ে বলল, সোনার বাঁশিতে কি সোনার সুর ঝরে? বাঁশের বাঁশি ছেড়ে সোনার বাঁশি কেন নিতে যাব!

শির শির বাতাসে বংশীর কষ্ট হচ্ছে ভেবে নীলা বলল, তোমার গায়ে দেখছি জামা নেই। শীত করছে নিশ্চয়ই? তোমাকে এমন পোশাক দেব যা পরলে দারুণ শীতেও খুউব গরম লাগবে।

তোমার পোশাকে কি দিনের রোদ্দুর রাতের কঠোর আগুন থেকেও বেশি গরম? বংশী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলল, আমার শীত করছে না।

ধুলো নুড়ি কাঁকর পথে চলার সময় নীলা আবার বলল, তোমার পায়ে দেখছি জুতো নেই। আমি তোমাকে রূপোর জরির নক্সা কাটা সুন্দর জুতো দেব, কেমন?

জুতো দিয়ে কি হবে? বংশী নিজেকে বীর বোঝাতে বলল, আমার পায়ে গরম লাগে না। নুড়ি কাঁকর কাঁটাও ফোটে না।

এরপর হঠাৎই নীলার মণিবন্ধে নজর পড়তে সোনালী চকচকে বস্তুটা দেখে অবাক হল।

বস্তুটার ভেতর উজ্জ্বল সবুজ আলো জ্বলছে নিভছে।

তোমার হাতে ওটা কি? বংশী জানতে চাইল।

ঘড়ি। এটা দেখে কতসময় হল বুঝতে পারা যায়। তোমার পছন্দ যদি তবে এটাই নাও। নীলা ঘড়িটা হাত থেকে খুলে সুমুখে ধরল।

দরকার নেই। বংশী নিতে অস্বীকার করে বলল, আকাশ সূর্য দিনের আলো রাতের তারা দেখেই আমি বুঝতে পারি সময় কত হল।

বেশ আমি তাহলে তোমাকে একটা বাদশাহী মোমদানি দেব। ঘরময় দিনের মতো আলো ছড়াবে। এবার বল, কি অজুহাতে আমার এই উপহার ফেরাবে?

মোমদানি আর কতটুকু আলো দেবে—চাঁদের চাইতেও বেশি নিশ্চয়ই নয়। বংশী আশ্চর্যরকম জ্ঞানীজনের মতো জবাব দিল, অজ্ঞানতাই অন্ধকার। পরিষ্কার মনের উদার দৃষ্টি থাকলে সব কিছুই আলোকময় উজ্জ্বল সুন্দর মনে হয়। পরমেশ্বরের সূর্য ভালো মন্দ সব প্রাণী প্রকৃতির ওপরই সমান আলো দেয়। ভেদাভেদহীন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বৃষ্টি বিতরণ করে।

এক অশিক্ষিত রাখালপুত্রের মুখ থেকে এত জ্ঞানের কথা শুনতে নীলার মোটেই ভালো লাগল না। একের পর এক উপহার প্রদান ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করায় আত্মঅহংকারে আঘাত লাগল।

সীমাহীন রাগক্ষোভ বিরক্তিতে নীলা মেজাজ হারিয়ে মুখরা হল, কিসের এত অহংকার তোমার? ভুলে যাচ্ছ, আমি রাজনন্দিনী। তোমাকে ঘেন্না করছি আমি।

আমি কিন্তু তোমাকে ঘেন্না না করে ভালোবাসি। বংশী আরও অধিকতর বিস্মিত করে দেবদূত কণ্ঠে বলল, ঈশ্বর বলেছে, শত্রুকেও ভালোবাসবে। যে অভিশাপ দেবে

তাকেও আশীর্বাদ করবে। যে ঘেন্না করবে তারও উপকার করবে। তারপর শান্তস্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে বোঝাল, রাগতো দুর্বলের অস্ত্র। শান্ত সংযমীরা অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী।

নীলা যেন শরতের জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করে শীতল হল। রাগ ক্ষোভ বিরক্তি উবে যেতে শ্রদ্ধায় আনত হল। মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকাল।

এই দেখ তোমার দেয়া নীল পাখির পালকটা। বংশী ধীর স্থির শান্ত চিত্তে স্মিত হাসল, আকাশ নীল সমুদ্র নীল তোমার চোখও নীল। তোমার দেয়া এই নীল পালকটাই আমি নিলাম।

আমাকে ক্ষমা কর। পরমপ্রীত নীলা বলল, রাজ ঐশ্বর্যে থাকায় ভুল অহংকার ছিল আমার। তুমি মহৎ পবিত্র মহার্ঘ। আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। ফিরিয়ে না দিয়ে গ্রহণ কর।

তা হয় কখনও!

কেন হয় না?

তুমি যে নীল। নীলা সকলের সহ্য হয় না। ভালোবাসতে হয় দূর থেকে।

সুজন, আমার কাছে সংক্ষেপিত নাম মিমু। দর্পণদা ওকে মুস্তাফীদা বলে সম্বোধন করে। সত্তরের দশকে উগ্র নারী আন্দোলনে হিজ স্টোরি (হিস্ট্রি) কে হার স্টোরি বয়কট কে গার্লকট করার দাবি ধোপে টেকেনি। কিন্তু মিস মিসেস পাল্টে এম এস বা চেয়ারম্যানের বদলে আজ যে চেয়ার পারসন প্রচলন তা সেদিনকার আন্দোলনেরই ফসল। তাছাড়া, চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর মিঃ মুস্তাফী সম্বোধনটা ওর শুনতে ভালো লাগছিল না। নিজেই বলেছে, 'মিস্টার' বিদায় না করলে সম্পর্কে দূরত্বটা কম বেশি থেকেই যাবে। তাতে এক সঙ্গে কাজ করতে অসুবিধা হবে। আমাদের এখন আরও একাত্ম হয়ে যাওয়া দরকার।

সবাই তাই হয়ে গেছে। অনুগত অনন্য জয়েশ নিগূঢ় প্রত্যুষ নিরুক্ত তো বটেই শুভেচ্ছা ঈর্ষা, পূষ্যা, কল্পিতা আর সেবন্তীও। সবাই 'দৃষ্টান্ত'কে নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করে। যে যেরকম পারে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। শুভেচ্ছা তো কর্মস্থল মাসকট থেকে প্রতি মাসে মোটা অংকের সাহায্য পাঠায়। রক্তিম প্রয়োজনীয় মুদ্রণ-কাজ বিনা পারিশ্রমিকে ওদের প্রেস থেকে করে দেয়। ঈষার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে সেই নারীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রণবাংশু আচার্য সূত্রে অনেক চিকিৎসাই আমাদের সাহায্য করে। পুষ্যার স্বামী রেবন্ত ঘোষদস্তিদার সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অফিসার। সরকারি নিয়মকানুন পদ্ধতি মতে সাহায্য সহযোগিতা করতে কসুর করে না।

সুজন, তুমিতো কোলকাতাতেই থাক। শ্রীরামপুরের 'গঙ্গামুখি' ফ্ল্যাটেও যাতায়াত কর। বিস্তারিত না হলেও কিছু না কিছু খবরতো নিশ্চয়ই জান। আমাদের কাসুন্দিয়ার বাড়িটার কিয়দংশে যে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী হয়েছে তা অন্তত তোমার অজানা

থাকার কথা নয়। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমন্বয় কমিটির অফিসটাও ওই বাড়িতেই। প্রতিভাবান অখ্যাতদের ক'খানা বইও বের করছে ওরা। বইমেলায় স্টল নেয় ওরা। প্রকাশনার নাম 'সম্ভাবনা'। 'সম্ভাবনা' থেকে দর্পণদার প্রথম উপন্যাস 'কলমে কার কণ্ঠস্বর' প্রকাশিত হয়েছে দু'বছর আগে। ওর প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় উপন্যাস 'সঙ্গনিঃসঙ্গ' শ্রবণার জন্যই এসব সম্ভব হচ্ছে।

'দৃষ্টান্ত' ছাড়া দ্বিতীয় কিছুতেই আর উৎসাহ নেই দর্পণদার। অথচ, এককালে কোথায় যেত না দর্পণদা! ময়দানে সেই মুক্তমেলা থেকে শুরু করে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, রবীন্দ্রসদন সুমুখে পঁচিশে বৈশাখের ভোরে সঙ্গীত আসর আর কেন্দুলিতে হিম-শীতল রাতে বাউল গানের আসর ইত্যাদিতে যাওয়া চাই-ই চাই। শরীর ঠিকঠাক না থাকলেও।

সেই মানুষ দর্পণদা হঠাৎই বইমেলায় যাওয়া বন্ধ করে দিল।

সেবার বইমেলার সময় শ্রবণা অবাক হয়ে জানতে চাইলে, আগে যেতে এখন যাও না কেন?

ভাল্লাগে না তাই। দর্পণদা নির্লিপ্ত উদাস কণ্ঠে জানাল, মেলা এককালে আমাকে ভীষণভাবে টানত। আমিতো সবচাইতে বিখ্যাত বড় সোনপুরের মেলাতেও গিয়েছিলাম একবার। ভারতবর্ষের নানা বৈচিত্র্যময় মেলা নিয়ে লেখা শুরুও করেছিলাম কিছুটা।

শেষ করলে না কেন?

চার দেয়ালের মধ্যে বই জার্ণাল পড়ে ওসব হয় না। নিজেকে যেতে হয়। জানতে অনুভব করতে হয়।

প্রশ্নতো সেটাই, যাওয়া বনধ করলে কেন?

বাবার মৃত্যুর পর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল তাই—

আর এখন? এখন তো কোনো সমস্যা নেই।

বল্লাম তো ভাল্লাগে না। খোলমেলা বাউলমেলা এখন কৃত্রিমতায় ভরা। রবীন্দ্রসদনের সামনে যেন ফ্যাশন প্যারেড আর বইমেলার খবরতো পেপারে পড়ছোই। টিভিতেও দেখছো। হুজুগ আমার ভীষণ অপ্রিয়। হুজুগ না হলে মিডিয়ার দৌলতে পর্দার নায়ক রাজনীতির নেত্রীর কবিতার বই হট কেক বিক্রি হয় কখনও। কবি আর কবিতা কি এতই সস্তা। লেখালেখি অনেক নিষ্ঠা অনুশীলন শ্রম প্রতিভার জিনিস। অনেক কষ্টের ফসল।

তবু এবার চল দুজনে মিলে যাই। শ্রবণা অনুরোধ জানিয়ে বলল, আমিতো প্রতি বছরই যাই। তুমি না গেলে আমারও একা যেতে মন চাইবে না।

প্রতি বছর যাও? দর্পণদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে জিগ্যেস করল, ক'খানা বই কেন? নিশ্চয়ই একখানাও না। শ্রবণা নিরুত্তর। দর্পণদা ফের কথা জুড়ল ক'জনের হাতে বই দেখেছো? উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ফের জিগ্যেস করল, সব চাইতে কোন

বই বেশি বিক্রি হয় জান? অভিধান। ডিকশেনারী। তারপর সঙ্গী ছোট ছেলে মেয়েদের আব্দার মতে শিশুপাঠ্য বই। তৃতীয় স্থানে ধর্মবিষয়ক বই। চতুর্থত—

থাক আর বলতে হবে না। শ্রবণা থামিয়ে দিয়ে অভিমানহত বলল, তুমি যেন সব গুণে হিসেব করে দেখেছো। বইমেলায় না যাওয়ার আরও যে একটা কারণ আছে সেটা তুমি বলবে না তা জানি।

সেই কারণটা শুনতে পারি কি?

সুজন চৌধুরীকে তুমি এড়িয়ে থাকতে চাও। ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাক তা তুমি চাও না।

একা সুজন চৌধুরীকেই নয়, আমার সমকালীন পরিচিত অনেককেই আমি এড়িয়ে থাকতে চাই।

কেন? অহংকার নাকি হীনম্মন্যতা?

দুটোর কোনোটাই নয়। আমার মতো অখ্যাতদের বই যে কিভাবে কোন কোন পদ্ধতিতে বের হয় সে তো আমার অজানা নয়। তবু বইমেলায় যেন বই না বেরুলে অনেকের ইজ্জতই থাকে না। সেসব অধিকাংশ বইয়েরই প্রচ্ছদ কাগজ মুদ্রণ নিকৃষ্টমানের। তবু বইয়ের লেখক বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে সগর্বে জিগ্যেস করবেই, তোর কি বই বেরুলো? কাটছে কেমন?

সত্যি কথাটাই বললাম, কোনো বইতো বের হয়নি আমার।

লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছিস বোধহয়? একই প্রশ্ন সবার মুখে।

একরকম তাই।

সুজন, বাবার মৃত্যুর পর দর্পণদা দীর্ঘদিন কিছু লেখেনি। আমিই আবার ওকে লেখা শুরু করিয়েছিলাম। 'দৃষ্টান্ত'র দায়িত্ব নেয়ার পর আবারও ওর লেখালেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্রবণার প্রেরণাতেই আবার নতুন করে কলম ধরেছে। দুটো নামী পত্রিকাতেও সম্প্রতি ওর গল্প বেরিয়েছে। হয়তো দেখেছো, কিন্তু পড়নি। পড়বে কখন? সেই সময়টা লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকলে কাজের কাজ হবে। সব নামী লেখকদেরই তো একই দশা। লেখার চাহিদা মেটাতে গিয়ে ঘরের চাহিদা মেটানোর সময়ে ঘাটতি দেখা দেয়। স্নান আহার নিদ্রার সময় ঠিক থাকে না। অসামাজিক হয়ে পড়তে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বড় দুঃখী পরাধীন তোমরা। ভাবতে গেলে কষ্ট হয়।

সুজন, এখন আমি এম এম পাবলিসিটি এ্যান্ড এ্যাডভারটাইজিং কনসার্ন-এর মালকিন। কাসুন্দিয়ার বাড়ির বাকি অংশ নিয়ে অফিস। ওই বাড়ির কেয়ার টেকারের নাম সুফল পাণ্ডে। সুফল বিয়ে করেছে কল্পিতাকে। সম্প্রতি একটি পুত্র সন্তান হয়েছে ওদের। আমি নাম রেখেছি সাবর্ণ।

এম এম পাবলিসিটিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সবরকম ব্যবস্থা আছে। সাকুল্যে

দশজন কর্মী কাজ করে। গত বছর আশাতীত লাভের মুখ দেখেছি। আপাতত দূরদর্শনে শুধু বিজ্ঞাপনের কাজ করছি। ভবিষ্যতে টেলিফিল্ম আর সিরিয়াল প্রযোজনার ইচ্ছা আছে। অবশ্যই দর্পণদার গল্প উপন্যাসও থাকবে। তখন তোমরা দুই বন্ধুতে প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হবে। কার কলমে শক্তি বেশি দেখা যাবে।

সুজন, কাসুন্দিয়ার বাড়ির সেই দোতলার ঘরটা আমি কিন্তু হাতছাড়া করিনি। কাজের চাপে রাতে থেকে যাওয়া দরকার হলে ওই ঘরেতেই কাটাই। সেজন্য নিজের মনের মতো করে সাজিয়েছি। একটাই মাত্র বাঁধানো ফটো আছে সেই ঘরে। মাদার টেরিজার। টেবিলের ওপর পাতা কাঁচের নিচে আছে মা কালীর ছবি। আর ছোট ছোট কাগজে আমাকে লেখা অজস্র উদ্ধৃতি। যে উদ্ধৃতিটুকু আমাকে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করে সেটি হল 'যে কর্ম পূণ্য উৎপাদন করে না, বৈরাগ্য আনয়ন করে না বা ভগবত-সেবায় প্ররোচিত করে না, সেই কর্মের অনুষ্ঠানে জীব জীবিত হলেও মৃত।'

আমি এখন মিমুর সঙ্গে পাকাপাকি নালিকুলের খামারবাড়িতে থাকি। গাছগাছালিতে নানান পাখির সম্মিলিত অর্কেস্ট্রা-শব্দে তরল অন্ধকার ভোরে ঘুম ভাঙে। কপালে সিঁদুর টিপ-রঙ সূর্য ওঠে। ভোরের নরম হলুদ রোদ্দুরে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, পেয়ারা ইত্যাদি গাছ আলোকিত করে। শস্য ক্ষেত সব্জি বাগান আহ্লাদিত হয়। নিম ছাতিম সজনে তেঁতুল আমলকি গাছে গাছে পাখিরা কিচির মিচির করে। ট্যাঁ ট্যাঁ বনটিয়া উড়ে যায়। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে শকুন শঙ্খচিল বাজপাখি ওড়ে। চিলচিৎকার কানে আসে। জারুল গাছে কাঠবিড়ালি লাফিয়ে বেড়ায়। চড়ুই ছাতার পাখি ফড়িং প্রজাপতি মৌমাছিরা ওড়াউড়ি করে। জল টলটল পুকুর পাড়ে মাছরাঙা দৃষ্টিফাঁদ পেতে থাকে। বিকেলে নারকেল তাল সুপুরি গাছের পিছনে সূর্য মুখ লুকায়। গোধূলি বিকেল গড়িয়ে গেলে সন্ধ্যার ডানায় চেপে রাতের অন্ধকার আসে। তারপর খই ছড়ানো তারায় ভরা আকাশে রুপোলী থালার মতো চাঁদ ওঠে। দুধসাদা জ্যোৎস্নার বন্যা বইয়ে দেয়। ফুলের বাগান জুড়ে জোনাকিরা আলোকসজ্জা করে। পুকুর পাড়ে করমচা আর লেবুগাছের ঝোপে ঝিঁঝিরা গানের জলসা বসায়। ব্যাঙেরাও থাকে বর্ষাকালীন মার্গ সঙ্গীতের আসরে। বসন্তে দক্ষিণা বাতাস বয়ে যায় ঝির ঝির শির শির। সেই বাতাসই আবার পাগলা হাওয়ায় বাদলা দিনে। ঋতু ভেদে প্রকৃতি সাজে বৈচিত্র্যময় পোশাক প্রসাধনে। হয়ে ওঠে মোহময়ী রহস্যময়ী অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী।

এখানে মিমু আর আমার জীবনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। মিমু জমি চাষবাসে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটির মানুষ হয়ে যায়। ওর ঘামে ভেজা শরীর থেকে লতাপাতার গন্ধ পাই। আমারও মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু, আমি চাইলেই তো তা সম্ভব নয়।

মিমু আর আমি সকালে যেখানে বসে চা খাই সেখানে ভোরের সোনালি রোদ্দুর এসে দুজনকে আলোকিত করে। রাতে জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে বিছানায় গড়াগড়ি খায়। মিমু তৃপ্ত আবেগে উচ্ছ্বসিত বলে, আর কি আমার চাই!

চাষাভূষো হয়ে যাওয়া মিমুর সারা বছরই চাষবাস তদারকি কাজ। দক্ষিণের একই জমিতে তিনবার আলু তিল আর ধান চাষ হয়। উত্তরে পেঁপে আর কলা বাগান। চার বিঘা জমি জুড়ে আছে মোহনফুলি পেয়ারাফুলি কলম আমের গাছ। ঘাট বাঁধানো বড় পুকুর ছাড়াও ছোট পুকুর আছে দুটো। মাছের চাষ ভালোই হয়। আছে, এক বিঘা ঢালু জলা জমি। বর্ষায় সেই যে জল জমে শুকায় মাঘ মাসে। আজকাল তো বারমাস নিম্নচাপ। অকালে বৃষ্টি লেগেই থাকে। সেজন্য অনেক বছর জলাভূমি শুকায়ও না। শাপলা ঢলকলমি হিঞ্চা আর কচুরিপানা ছেয়ে থাকে। সাদা বক আসে দল বেঁধে মাঝে মধ্যে পানকৌড়িও দেখা যায়।

কি চায় হয় না সব্জী বাগানে? কুমড়ো শসা ঝিঙে ঢেঁড়শ করলা পালং পুঁই কপি মুলো পিঁয়াজ বেগুন লংকা—যখন যেরকম।

সকালের চা খেয়ে মিমু সেই যে মাঠে যায় ফেরে দুপুরে খাবার খেতে। মাঝে মোহন গিয়ে টিফিন দিয়ে আসে। দুপুরে বিশ্রামের পর তিনটেয় বেরিয়ে গিয়ে ফেরে বিকেলে। জনমজুরদের বিদেয় দিয়ে তারপর। আমার সঙ্গে মিমুর দেখা হয় সেই রাত্রে। সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত অব্দি মিমুর সঙ্গী বলতে ওই জনমজুররাই।

আমাদের খামার বাড়ির চারদিকে ঘিরে বিস্তর ফুলের গাছ। বোগনভেলিয়া মাধবীলতা ঝুমকালতা আর অপরাজিতা। জবা টগর গন্ধরাজ হাসুহানা গোলাপতো আছেই। আছে রঙ্গন করবী আর কনকচাঁপা।

শীতে শিউলি পদ্ম ফোটে। হরেক মরশুমি ফুলের চাষও হয়।

জলাজমির ধারে কদবেল গাছ আছে একটা। আছে অশোক শিমূল কৃষ্ণচূড়া। আরও কত কী যে!

আমি সাধারণত সকাল দশটার মধ্যে তারকেশ্বর লোকাল ট্রেন ধরি। হাওড়ায় নেমে বাস ধরে কাসুন্দিয়ার অফিসে যাই। সারাদিন সেখানেই কাটাই।

রবিবার আমার ছুটির দিন। কিন্তু মিমুর কোনো ছুটি নেই। একা একা ঘরে বসে কেমন করে সময় কাটাই। তাই ছুটির দিনেও একই সময়ে ট্রেন ধরি। বৈদ্যবাটির 'দৃষ্টান্ত'তে হাজির হই। দর্পণদা আর শ্রবণার সঙ্গে গল্প করে যখন একঘেয়েমি এসে যায় ভেতরে ঢুকে আশ্রিতাদের কাজকর্ম দেখি। তারপর অন্যদিনের মতো একই সময়ে নালিকুলের খামারবাড়িতে ফিরে আসি।

এই হল মিমু আর আমার ছকে বাধা জীবন।

'বীজরূপী পুরুষ আর আধার রূপ নারী।'

অন্যমতে, নারীরা হল শস্যক্ষেত।

আমি ক্ষেত হতে পারি, কিন্তু শুধুমাত্র মাটির গুণেতো আর শস্য ফল ফলে না। হল কর্ষণ বীজবপন দরকার হয়। তবেই না সৃষ্টি।

মিমু আর আমার যা কিছু সৃষ্টি তা মাটিহীন বহির্বিভাগে।

সুজন, সেদিনও ছিল তেমনি বাদল দিন। পাগলা হাওয়া বইছিল। ঘন ঘোর বর্ষা। সেই সঙ্গে আকাশ বিজলীসহ বুক ধুকপুকানি বজ্রপাত।

আমি রোজকার মতো বের হতে পারলাম না। খোলা জানলার ধারে একা চুপচাপ বসে আছি। বাতাসে মিহি বৃষ্টিকণা এসে পড়ছে আমার গায়। আমি শির শির শিহরিত হচ্ছিলাম।

আমি দূরে নজরে ছুটিয়ে আলু ক্ষেতের দিকে দেখলাম। গত বছরও এমনি আলু গুদামজাতকালে নিম্নচাপের বৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় বৃষ্টিতে আলুর ক্ষতি হয়। আমাদেরও হয়েছিল। এবার তাই মিমু আগেভাগে ক্ষেতে জনমজুর নামিয়েছে। কাল থেকে খড়ের চালাঘরে আলু উঠছে। ওখান থেকে পরে হিমঘরে যাবে। অঘ্রাণ অব্দি রাখতে পারলে মুনাফা ভালো হবে।

বেসরকারি চাকরির গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় মিমু শৃঙ্খলাপরায়ণ কাজ পাগলা মানুষ। ফাঁকি দেয়া কাকে বলে জানে না। চাষের বেলাতেও তেমনটি আছে। জানি, সব আলু ঘরে তোলা শেষ না করে ফিরবে না। যদিও আকাশ পাতালে ভয়ংকর দুর্যোগ। জীবন-ঝুঁকি নিতে ভয় পায় না।

তবু অশুভ আশঙ্কায় আমিও ঝুঁকি নিলাম। কামরাঙা চালতা সবেদা বাদাম গাছের বাগান পার হলাম। তারপর কচু জঙ্গলের পাশ দিয়ে আলু ক্ষেতে পৌঁছালাম। মিমুকে মেজাজ দেখিয়ে বললাম, দরকার নেই আমার লাভ করে। হোক লোকসান। বাজের ঘায়ে মরবে নাকি তুমি। এক্ষুনি ঘরে চল। এইতো শেষ হয়ে গেল। মিমু নিরুদ্বিগ্ন বলল, তুমি যাও। ওদের মজুরি মিটিয়ে দিয়ে আসছি।

সুজন, গৃহমুখি আমি তখন ছুটছিতো ছুটছিই। যেন 'মায়াবন বিহারিণী হরিণী'? বৃষ্টিস্নাত শরীর জুড়ে 'রহি রহি' আনন্দ তরঙ্গ।'

ফিরে এসে দাওয়ায় বসলাম। উদাসী হয়ে পড়লাম। মনে পড়ল, 'এমন দিনে তারে বলা যায়।'

মিমু এলো। উদোম গা। চওড়া বুক। শক্ত চেহারা। ভেজা চুল। শরীর থেকে ভেসে আসছে বুনো ঘাসপাতা আর মাটির সোঁদা গন্ধ।

মিমু আমার মুখোমুখি বসল।

'নিভৃত নির্জন চারিধার/দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুঃখে দুঃখী/আকাশে জল ঝরে অনিবার/জগতে কেহ যেন নাহি আর/সমাজ সংসার মিছে সব/মিছে জীবনের কলরব।'

হঠাৎ মনে হল, মিমু প্রকৃতির মতো সতেজ সবুজ হয়ে উঠছে। বর্ণ বদলাচ্ছে। দু'চোখে আবেগমুগ্ধ শিমূল রক্তিমতা। নিশ্বাসে আগুন-উষ্ণতা। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। কপালে জমছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দু'চোখে সুগভীর প্রত্যাশা।

আমি বিমুগ্ধ। যেন অকল্পনীয় স্বর্গীয় সুন্দর পুরুষ আমার সুমুখে।

আমি বিস্ময়াবিভূত ভাবলাম, এই কি তাহলে নির্জনে আভ্যন্তরীণ শক্তি সঞ্চয়ের অন্য এক বহিঃপ্রকাশ। যদি তাই হয় তাহলে তো সফল আমার তপস্যা।

সত্যতা যাচাই করতে কমলা কোয়া ঠোঁট প্রস্ফুটিত করলাম। সুগভীর আরণ্যক আহ্বানে আবেগ উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তাকালাম। দু হাতের নিবিড় আলিঙ্গন চুম্বনে ওকে প্ররোচিত করলাম। অস্ফুট স্বরে বললাম, অস্থির মস্তিষ্ক প্রবল হতাশা আর অধিক মদ্যপান তোমার রক্তচাঞ্চল্যের প্রতিবন্ধক। মিমু তুমিতো কোনো মৃত গাছ বা আগ্নেয়গিরি নও। এখন সবরকম প্রতিবন্ধকতা মুক্ত স্বাভাবিক মানুষ। আমার বিশ্বাস, তুমি পারবে। আত্মবিশ্বাস থাকলে নিশ্চয়ই ঘুমন্ত পুরুষ—তেজ তুমি ফিরে পাবে। চেষ্টা করে দেখ।

আমার প্ররোচনা প্রেরণা আর সক্রিয় সহযোগিতায় মিমু আশ্চর্য রকম উদ্দীপ্ত হয়ে সক্ষমতা ফিরে পেল। ফলশ্রুতি, আমি মৌমিতা মুস্তাফী হয়ে গেলাম।

তারপর একসময় মিমু আর আমি জনক জননীও হলাম। ছেলের নাম রাখলাম, মনন।

সিঞ্চিতার জন্য দুঃখ করুণা বেদনা হত বুঝতাম না। তবে গর্ববোধ করতাম। ভাবতাম, ও ব্যর্থ আমি সফল। একজন শূন্য। অপরজনের পরিপূর্ণতা। দূরদর্শী আধ্যাত্ম ও বাস্তববাদী দর্পণদার সেই পাখি নিয়ে লেখা প্রতীকী গল্পটা মনে পড়ে যেত।

দর্পণদা লিখেছিল, ভোগের আনন্দ তো ক্ষণিকের সেখানে ভালোবাসা মূল্যহীন। শুধুই প্রবঞ্চনা। শূন্যতার আস্ফালন। পরিণামে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা।

তখন শিশির ভেজা ভোরের সোনালি রোদ্দুরের সময়। বাতাসে ছাতিম ফুলের মিষ্টি গন্ধ। গাছেদের চিকন পাতায় শির শির শব্দ। শুকনো পাতা ফুলের পাপড়ি ঝরছে ঝুর ঝুর।য পাকা ধানের ক্ষেতে রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু। তরল রুপোর মতো চিক চিক নদী। কুলু কুলু বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি ঝোরা। গুণগুণ গাইছে মৌমাছি। রঙিন প্রজাপতি ফড়িং উড়ছে পত্‌পত্‌ ফর্‌ফর্‌। তিড়িং বিড়িং উড়ছে চড়ুই টুনটুনি বুলবুলি মৌটুসি। সজনে ডালে দোল খাচ্ছে নীল পাখি। ঘুঙুর পরা ঝরণায় টুংটাং শব্দ। পাশে ছোট্ট জলাশয়ের কাকচক্ষু জলে কুঞ্চিত রেখা। কিছু অংশে শ্যাওলা লতা পাতায় ভরা। ছোট ছোট লাল সাদা বেগুনি ফুল ফুটে আছে। ছোট পোকা-মাকড় ভেসে বেড়াচ্ছে। সবুজ ঘাসের মাঠে চরছে দুধেল গরু-মোষ ছাগল। ঘুরছে ফিরছে বনবেড়াল কাঠবেড়াল বাছুর মুরগী আর তুচ্ছ যত পাহাড় মাটি তৃণ বনবাসী।

গোলাপী পাখিটা যেন কিছুই দেখছিল না। চোখের সামনে শুধু আকাশি-স্বপ্ন। সে পলাতকা কিশোরীর মতো স্বপ্ন-মোহাবিষ্টা।

কোথায় যাচ্ছ তুমি? সমবেত শুভাকাঙ্খীদের একজন জিগ্যেস করল।

আকাশে বর্ণালী মেঘের দেশে। গোলাপী পাখিটা জবাব দিল।

বর্ণ গন্ধ রূপ রসতো এখানেই। আকাশে কী ফুল ফোটে, ফল হয়? জলাশয় পাবে? নিশ্চিন্তে ঘুমোবার ব্যবস্থা আছে?

এখনকার সীমাবদ্ধ জীবন আমার ভাল্লাগে না। অসীমে আমি যাবই।

গোলাপী পাখিটা অসীমের দিকে গা ভাসায়। পাশে ভ্রমণসঙ্গী হলুদ পাখিটা।

তারপর গোলাপী পাখিটা একসময় পথহারা নিঃসঙ্গ অসহায় একা হয়ে বুঝেছিল, বড় জগতের সঙ্গীদের মনটা ছোট হয়ে থাকে। ওরা স্বার্থ নিয়ে সুখের দিনে ভিড় জমায়। সুযোগ বুঝে ঠিক সময়ে পালিয়ে যায়।

সুজন, 'গঙ্গামুখি'তে সিঞ্চিতাকে তুমি ব্যক্তিগত করে রেখেছিলে। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে হত, সিঞ্চিতা কেমন আছে। গোলাপী পাখির মতো নিঃসঙ্গ অসহায় একা হয়ে পড়েছে কিনা।

কিন্তু, জানব কেমন করে? যদিও শ্রীরামপুর আমার যাতায়াতের পথে পড়ে, যাওয়া দরকার হয়নি কোনো উপলক্ষ্যে। ইতিহাস-খ্যাত উইলিয়ম কেরী সাহেবের কলেজ চার্চ প্রেস আর সমাধি দেখতে যাই নি আজও। মনন হোলিহোম স্কুলেও পড়ে না। এসবই শুনছি 'গঙ্গামুখি'র কাছাকাছি।

সেবন্তী একদিন বলল, অবন মাহেশের রথ দেখতে চায়। বই-এ পড়ে ভীষণ বায়না ধরেছে।

আমি বললাম, আমরাও তো ওর বয়সে গল্পটা পড়েছি। তখন জানতামই না মাহেশ কোথায়। কল্পনায় দেখতে পেতাম। বইয়ের অক্ষরে চোখ রেখে যেন সেই রথের মেলায় পৌঁছে যেতাম। আজও অবন-বয়সীরা অনেকেই হয়তো তেমনি পৌঁছায়।

এমন কালজয়ী লেখা হচ্ছে কোথায় আজকাল। সেবন্তীর মুখাবয়বে বিরক্তি প্রকট হয়ে ওঠে, যতসব অগভীর বিশ্লেষণ। দর্শন মনস্তত্ত্ব জীবন বোধ—কিছু নেই।

আসলে তেমন বোদ্ধা বা রসিক পাঠক পাঠিকাদের সংখ্যাটা ক্রমশ কমে আসছে যে। আমি একালের লেখকদের স্বপক্ষে যুক্তি দেখালাম, বই বাজারের চাহিদাটাতো মগজে রাখতে হয়।

বাবা তাই বলে। সেবন্তী বই ছেড়ে টিভি সিরিয়াল প্রসঙ্গে গেল, সিনেমাতে না হয় ভাবনা থাকে, দর্শক খাবে কি খাবে না। ফ্লপ করলেই ভরাডুবি মাথায় হাত। তাই কেউ ঝুঁকি নিতে চায় না। কিন্তু টিভি সিরিয়ালে তো তেমন আশঙ্কা থাকে না। তাহলে কেন ভালো গল্প থাকে না?

সেখানেও অনেক হিসেব নিকেশ থাকে। কোন সিরিয়ালে দর্শক কত তার সমীক্ষা হয়। যত দর্শক তত বেশি এ্যাড। সেই বাজারি ব্যাপার স্যাপার।

অর্থাৎ কিনা বেশি মুনাফার হিসাব নিকাশ। সেবন্তী আক্ষেপ স্বরে বলল, সাহিত্য সঙ্গীত সংস্কৃতির জগতে এখন পণ্যটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা সব অনাসৃষ্টি ব্যাপার। একই ব্যক্তি কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ সঙ্গীত সৃষ্টিকার। পরিচালকও বটে। সবাই যেন সত্যজিৎ রায়।

থাক ওসব প্রসঙ্গ। আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, মিডিয়া আর এ্যাড দৌলতে এসব চলছে যেমন চলবেই। দু'একজনের বিরূপ সমালোচনায় কিছু এসে যাবে না।

সুজন, সেবন্তী আর অবনকে আমি মাহেশের রথ দেখতে আসার আমন্ত্রণ

জানিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে নালিকুলের খামার বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণও ছিল।

ওরা এসেছিল। চারদিকের দৃশ্য দেখে সেবন্তী বেজায় খুশি। অবন দুদণ্ড বসে থাকতে চায় না। মন মাতানো এমন একজন সঙ্গী পেয়ে মননও চঞ্চল উচ্ছল চপল লাগামছাড়া।

সময়টা যদিও আষাঢ় মাস, সেদিন বৃষ্টি ছিল না। 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি।' ছুটির আনন্দে মুক্ত পাখির মতো অবন মনন-এর সেকি ছোটাছুটি হাসিতে লুটোপুটি। মিমুও, ক্ষেতের কাজ তদারকি ছেড়ে ওদের সাথী।

দুপুরের খাওয়ার পাট চুকে যেতে মিমু বলল, কাল কোন্নগরের প্লাটফর্মে ফের একটা খুন হয়েছে। ট্রেন থেকে নামতেই গুলি। কানাইপুরের ছেলে। আজ বদলা নিতে কে কখন কাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে কে জানে। ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন অবরোধ। এদিকের ট্রেন লাইনে অবরোধ তো জলভাত ব্যাপার। ওরা যাতে মুশকিলে না পড়ে সে জন্য ড্রাইভার বলে রেখেছি। রথেৰ মেলায় যাওয়ার পথে দর্পণদার ছেলেমেয়েকেও তুলে নিয়ে যেও।

একবার ফোন করে বলে দাও না যাতে রেডি হয়ে থাকে।

ফোন করেছিলাম। তিনটেয় রেডি থাকতে বলেছি।

সুজন, বৈদ্যবাটি শেওড়াফুলি চাতরা হয়ে শ্রীরামপুরে জ্যামজটে আকাশচুম্বি একটা বিশাল বহুতল বাড়ির সুমুখ পথে গাড়িটা থমকে দাঁড়াল। আমি যেন বিরাট কিছু আবিষ্কার করলাম, এই সেই 'গঙ্গামুখি'!

ভাবলাম, সেবন্তী ওরা সঙ্গে না থাকলে সিঞ্চিতার সঙ্গে দেখা করার সুবর্ণ সুযোগ ছিল।

রথের মেলার জ্যাম কি এখান থেকেই শুরু? সেবন্তী স্বগত প্রশ্ন করল।

মহেশ এখনও অনেক দূর। ড্রাইভার দূরে দৃষ্টি ছুটিয়ে জ্যামের কারণটা কি বুঝতে চেষ্টা করে বলল, মনে হচ্ছে অন্য কিছু ঝামেলা আছে।

পথ অবরোধ! আমার কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক।

উদ্বেগ মনে হল ড্রাইভারেরও। সে গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে জানাল, এ্যাক্সিডেন্ট। মারুতি আর এ্যামবাসাডারে। ওভারটেক করতে গিয়ে মারুতিকে মেরেছে। যা বডি মারুতির। একদম ফালতু গাড়ি। থ্যাবড়া মুখে পড়ে আছে। এ্যামবাসেডারের কিছু হয়নি।

লোকজন কারও কিছু? আমি জানতে চাইলাম।

মারুতির মালিক নিজেই চালাচ্ছিল। শুনলাম, হেভি জখম হয়েছে। তবে বেঁচে যাবে। কাছেই ওয়ালস্ হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

জ্যামজট খুলতে গাড়ি চলাচল শুরু হল। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত মারুতিটা নজরে পড়ল। নম্বর দেখে সেবন্তী চিনতে পারল। ভয়ার্ত পাণ্ডুর চোখ মুখে ফিসফিসিয়ে বলল, এতো দেখছি সুজনের গাড়ি।

তাই আমি আঁতকে উঠলাম।

ব্যস্, এ যাত্রায় আমাদের দুজনের আর মাহেশের রথ দেখা হল না। ছোটরা যাতে টের না পায় সেজন্য ড্রাইভারের হাতে ওদেরকে মেলা দেখানোর দায়িত্ব সঁপে দিয়ে দুজনে হাসপাতালে নেমে পড়লাম।

তোমরা যাবে না? অসম্ভব গম্ভীর বিষণ্ণ অবন বলল, তোমরা এখানে নামছো কেন?

একজনকে দেখতে যাচ্ছি। সেবন্তী অস্বস্তি বোধ করল।

আমি জানি, গাড়িটা কার। অবন বায়না ধরল। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

না, যাবে না। সেবন্তী শাসন স্বরে বলল, পাকামো করো না। মেলা দেখিয়ে গাড়ি ফের এখানেই আসবে। তখন দেখা যাবে।

সুজন, তারপর বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে তোমার শয্যার হদিশ পেলাম। বিপদমুক্ত জেনে কিছুটা চিন্তা আর উত্তেজনা মুক্ত হওয়া গেল। আমি সেলফোনে যতজনকে সম্ভব তোমার দুর্ঘটনার সংবাদটা দিলাম। ওদেরকেও চেনাজানাদের রিলে করে দিতে বললাম।

যে কোনো সূত্রেই হোক খবর পেয়ে শত্রু মিত্র অনেকেই এলো। ফেরিঘাটের আড্ডার হারানো পুরনো বন্ধুরা যে যেমন খবর পেয়েছে এসেছে। মিমু পর্যন্ত বাদ যায়নি।

আসেনি শুধু একজন। সে তোমার ব্যক্তিগত। আসেনি তোমার নামযশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। সিঞ্চিতা মিডিয়া থেকে দূরে আড়ালে থেকে নিয়মিত দর্পণদার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। খোঁজ খবর নিয়েছে। 'দৃষ্টান্ত'তেও এসেছে ক'বার। একবার তো আমার সঙ্গেও ওই 'দৃষ্টান্ত'তেই দেখা হয়েছে। বিস্তর খোলামেলা আলোচনাও হয়েছে দু''জনে।

সিঞ্চিতার মুখ থেকেই শোনা, ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দেবে শুনে অবাক হয়ে ও জিগ্যেস করেছিল, তাহলে আমি থাকব কোথায়?

সেটা তোমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। তুমি নিরাসক্ত জবাব দিয়েছিলে।

অর্থাৎ কিনা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছো! সিঞ্চিতা কান্না রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছে, কিন্তু আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তুমি। সেই ভরসাতেই আমি ডিভোর্সী হয়েছি। সেবন্তীর সঙ্গে সেপারেশন না হওয়া অবস্থায় আমাকে বিয়ে করা সম্ভব নয় বুঝি। তাই বলে আমার প্রতি দায়দায়িত্ব কর্তব্য তুমি কোনোমতেই এড়িয়ে যেতে পার না।

এখন নিশ্চয়ই পারি। তুমি রুক্ষ মেজাজে বলেছিলে, এখন তো তুমি আর শুধুমাত্র আমাতেই সীমাবদ্ধ নেই। পাকা খবর আছে, আজকাল আরও অনেকেই তোমার কাছে যাতায়াত করছে। আমারই ফ্লাটে রীতিমতো মধুচক্র চলছে। সত্যি কিনা?

তোমার মতো বিশিষ্ট দু'একজন যে আসে তা অস্বীকার করছি না। সিঞ্চিতা

সরাসরি তোমাকে দায়ী করে বলেছে, তুমি ক্রমশই হাত গুটিয়ে নিচ্ছিলে। টাকা চাইলেই বিরক্তি প্রকাশ করে বলতে, এর চাইতে বেশি টাকা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিলাসিতা কমাও। হিসেব করে খরচ করতে শেখ। যদি তা না পার নিজে কিছু রোজগারের চেষ্টা কর।

বেশ তাই না হয় করব। সিঞ্চিতা নির্ভেজাল অনুরোধ জানিয়েছে, একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও।

চাকরি যেন হাতের মোয়া আর কি। তুমি নির্মম বিদ্রূপ করে বলেছো, রূপ ছাড়া এমন কি যোগ্যতা আছে তোমার চাকরি পাবে। থাকলে, নিজেই চেষ্টা করে দেখতে পার।

সুজন, চেষ্টার কসুর করেনি সিঞ্চিতা। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রলোভন প্রতারণা ছাড়া কিছুই পায়নি। তারপর বাধ্য হয়ে ওই রূপের বিনিময়ে রোজগারের পথ ধরেছিল। প্রকাশ্যে নয়, শোভন গোপন সৌন্দর্য বজায় রেখে।

অথচ, আশ্চর্য অদ্ভুত প্রতিভাধর গুণীজন তোমরা সেদিন 'মুখর মেলা'য় অনেকেই সহমত সোচ্চার ছিলে যে, সমাজের চোখে যৌনকর্মী পরিচয়ের বদলে নারী বা পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদা পাওয়া উচিত। গোটা নারী সমাজ থেকে এদেরকে আলাদা করে রাখা ঘোরতর অন্যায়। যৌন ব্যবসাকে সমাজের অঙ্গ বলে মেনে নিলেও পারিবারিক কাঠামোর কোনো হেরফের হবে না।

তুমি যখন মঞ্চ থেকে এমনতর বক্তব্যে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করছিলে সেই সময় সিঞ্চিতা সম্ভবত যন্ত্রণায় অস্থির উত্তেজিত হয়ে পড়ে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে প্রতিবাদিনীর ভূমিকায় দৌড়ে মঞ্চে উঠে যায়। উপস্থিত দর্শক শ্রোতা বক্তাদের হতচকিত করে তোমার গালে চড় বসিয়ে দেয়। তারপর ভাগ্যিস কান্নায় ভেঙে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে মঞ্চে লুটিয়ে পড়ে। নৈলে সেদিন হয়তো অনেকেরই মুখোশ খুলে ফেলত।

সুজন, সেদিনকার মেলার উদ্যোক্তাদের পরিস্থিতি-সামাল দেয়া ভাষায় সিঞ্চিতা ছিল বিকৃত মস্তিষ্কের এক অজানা অচেনা মহিলা। সিঞ্চিতা কিন্তু সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চেয়েছিল। 'দৃষ্টান্ত' হতে আশ্রয়ও পেয়েছিল। উইভিং নিটিং টেলারিং শিখে স্বাবলম্বী স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হঠাৎই একদিন ওর মৃতদেহটা পোদ্দার ঘাটের গঙ্গা জলে ভাসতে দেখা যায়। গঙ্গামুখি থেকে গঙ্গা জলে। পুলিশের অনুমান, আত্মহত্যা নয়। সন্দেহ, সুপরিকল্পিত খুন। ব্যাস্, ওই পর্যন্তই। এরকম তো কতই হয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত সেই কথাটাই সত্য হয়ে দাঁড়াল। সেই যে, 'পুরুষ অনেক ঠেকে ঘা খেয়ে তারপর ভালোবাসতে শেখে।' সুজন, তুমিতো এখন সপুত্র সেবন্তীকে নিয়ে সুখ শান্তির স্বাভাবিক দিন যাপন করছো।